বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

জুন, ২০২৪ খ্রি.

৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

মাসিক

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

৩য় বর্ষ | ৫ম সংখ্যা | জুন, ২০২৪ খ্রি.

প্রতিষ্ঠা

ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. / শাবান, ১৪৪৪ হি. / ফাল্গুন, ১৪২৮ ব.

উপদেষ্টা

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানি হা.

তত্ত্বাবধায়ক

আব্দুল্লাহ আল মামুন আশরাফী

প্রধান সম্পাদক

মাকামে মাহমুদ

সম্পাদক

উসমান বিন আ. আলীম

নির্বাহী সম্পাদক

বিন-ইয়ামিন সানিম

বিভাগীয় সম্পাদক

কাজী মা'রুফ
রাশেদ নাইব

ব্যবস্থাপনায়

মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের, মুফতী ইমদাদুল্লাহ,
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী, আনিসুর রহমান আফিফি,
মুফতী মাসউদ আলিমী, মুহা. সায়েম আহমাদ,
মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ, মুহা. হাছিব আর রহমান,
মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসিন,
শামসুল আরেফিন, তাশরীফ আহমদ,
জাবের মাহমুদ, মাও. হাবিব উল্লাহ,
জুবায়ের আহমেদ, মুফতী সাইফুল্লাহ,
হুসাইন আহমদ, মুহা. আব্দুর রশীদ।

যদি নবীনকণ্ঠ 'প্রিন্ট' করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম, তাহলে বেশি ভালো লাগত। আপাতত 'পিডিএফ' করে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আলহামদুলিল্লাহ। দু'আয় আমাদের স্মরণ করবেন।

যোগাযোগ

অস্থায়ী ঠিকানা : বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা। সম্পাদক : ০১৭৮৯২০৪৬৭৪
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৪৭৬২৯৮০৯ ইমেইল : nobinkanthobnlf@gmail.com

৩য় বর্ষ । ৫ম সংখ্যা
জুন -২০২৪

তারুণ্য
বিনির্মাণের লক্ষ্যে
'নবীনকণ্ঠ'
এবারের জুন সংখ্যায়
যারা লিখেছেন:

লেখক সূচী

কুরআনের আলো

মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসিসন

হাদীসের আলো

মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের

ইতিহাস

ছফওয়ান আল মুসাইব
জিশান মাহমুদ

প্রবন্ধ

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
মুফতী আইয়ুব নাদীম, আবরার নাঈম,
রতন বসাক, শেখ সজীব আহমেদ,
রাইহান উদ্দিন, মুফতী উবাইদুল্লাহ তারানগরী

গল্প

হাবিবুর রহমান
মুহিউদ্দীন ইবনে মোস্তাফিজ
মাসরুর বিন নূর মোহাম্মাদ
রফিকুল ইসলাম রিয়াদ
লবীব আহমদ
মোফাজ্জল হোসেন শান্ত
আমাতুল্লাহ ফাতেমা
শাশ্বত বোস, দ্বিপ্রহর
ফয়সাল হাসান শুভ্র

ফিচার

আব্দু শুক্কুর, ইব্রাহিম হাসান

ছড়া/কবিতা

রুশো আরভি নয়ন, সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম,
মুহাম্মাদ তালহা মাহমুদ, মুহাম্মদ নূর ইসলাম, শাজাহান কবীর শান্ত,
মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, এম আর মাহফুজ, নবী হোসেন নবীন,
মুহাম্মদ আলম জাহাঙ্গীর, মানসী খাতুন, নূর-ই-ইলাহী, আব্দুল আহাদ,
তপন মাইতি, দিলীপ কুমার মধু, সাঈদুর রহমান লিটন, রেদওয়ানুল্লাহ,
বিদ্যুৎ মিশ্র, রথীন পার্থ মণ্ডল, মো. আলাউদ্দিন, মাহমুদ হুজাইফা,
জাহিদুর রহমান আব্দুল্লাহ,

রোযনামচা

মুহা. আশিকুর রহমান খান
সৈয়দা ফারিহা আকতার
খালিদ নিশাচর

জীবনচরিত

আব্দুল্লাহ আল মামুন আশরাফী

ভ্রমণকাহিনি

সামীউল হক নাজিব

নবীন কণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে ...

ঈদুল আজহা; মুসলিমদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ইসলামের মৌলিক পাঁচ স্তম্ভের একটি হলো হজ আদায়। আর এই হজের অন্যতম অনুষঙ্গ কুরবানি। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সারা পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মানুষ হজব্রত পালন করতে সমবেত হয়েছেন আরাফার ময়দানে। বাংলাদেশ থেকেও গিয়েছেন প্রায় ৮৫ হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলিম। যদিও নিবন্ধনের কোটা ছিল এক লাখ ২৭ হাজার, কিন্তু চার চারবার নিবন্ধনের সময় বাড়ানোর পরেও এক তৃতীয়াংশ কোটা খালিই রয়ে গিয়েছে। যাহোক, এর বিভিন্ন কারণ আমাদের জানা আছে।

ত্যাগের মধ্যেও যে আনন্দ আছে, সেটাই মূলত ঈদুল আজহার শিক্ষা। আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে তার প্রিয় বস্তু কুরবানি করতে বলেছেন। এরপর হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামকে কুরবানি দেওয়ার জন্য নিয়ে যান। এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য প্রদর্শন করেন। এ সময় আল্লাহর নির্দেশে ইসমাইলের বদলে সেখানে একটি দুম্বা কুরবানি হয়।

পশু কুরবানির মাধ্যমে মানবমনে বিরাজমান যাবতীয় পশুত্ব তথা নির্মমতা, ক্রোধ, হিংসা, অত্যাচারী মনোভাবের অশুভ কর্মকাণ্ডের মূলোৎপাটন ঘটানোর দীক্ষাই কুরবানির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ পেয়ে থাকে। কুরবানির বিধানের মাধ্যমে সমাজে একের সম্পদে অন্যের অধিকারের বিষয়টিও

বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়। এজন্য পবিত্র ঈদুল আজহা ত্যাগের দীক্ষায় পরিশুদ্ধ জীবন গঠন ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলনও বটে। এতে থাকতে পারে না কোনো লৌকিকতা বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থ। এজন্য বজারের সবচেয়ে বড়, উচ্চ বংশীয় (!) গরু ক্রয় করে বা একাধিক কুরবানি করে বড়াই করার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। কেননা এধরনের রিয়া বা লৌকিকতা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। এটি ছোট শিরকেরও অন্তর্ভুক্ত। কিয়ামতের দিন রিয়াকারীরা সকলের সম্মুখে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, কুরবানির পশু ক্রয় ও তা জবাই করে মাংস ভক্ষণই সকল কিছু নয়। এই সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও শিক্ষা রয়েছে। আর তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট না তাদের কুরবানির গোশত পৌঁছে, না তাদের রক্ত-বরং পৌঁছে যায় তোমাদের ধার্মিকতা' (সুরা হজ, আয়াত : ৩৭)।

কুরবানির যথাযথ নিয়ম মেনে চললে একদিকে মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জিত হবে, অন্যদিকে কুরবানির মাংস গরিব ও অসহায় মানুষকে যথাযথভাবে বিতরণ করলে ধনী ও গরিবের বৈষম্য দূর হবে। সামাজিকভাবে ভালোবাসার এক অনুপম বন্ধন সৃষ্টি হবে। কুরবানি একটি আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আসুন, আমরা সবাই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে কুরবানির বিধান পালন করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইখলাসের সাথে কুরবানি করার তাওফিক দান করেন, আমিন।

কোরআনের আলোকে কুরবানী

পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে আজ অব্দি যে সমস্ত ইবাদতের ধারা অব্যাহত আছে তার মধ্যে অন্যতম হল কুরবানী। 'কুরবানী' শব্দটি ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হলেও আরবিতে মূল শব্দটি 'কুরবান'। যার অর্থ হচ্ছে, নৈকট্য। তাই আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের জন্য যে আমল করা হয় তাকে আভিধানিক অর্থে 'কুরবান' বলা যেতে পারে। তবে শরীয়তের পরিভাষায় কুরবানী দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বিশেষ কোন পশু আল্লহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট দিনে জবাই করা। যার সূচনা ইবরাহিম আ. এর স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হওয়া থেকে। হজরত ইবরাহিম আ. এর পুত্র হজরত ইসমাইল আ. এর যে বিরল আত্মত্যাগ ও কুরবানি আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সপে দিয়েছেন, তা সত্যিই প্রতিটি বান্দার জন্য উপলব্ধির বিষয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে পিতা পুত্রের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, *"অতঃপর যখন সে(ইসমাইল) তার সাথে চলাচল করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে (ইবরাহিম) বলল, হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি, অতএব দেখ তোমার কী অভিমত'; সে বলল, 'হে আমার বাবা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আমাকে ইনশা আল্লাহ আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন'। অতঃপর তারা উভয়ে যখন আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তাকে জবাই করার জন্য শায়িত করল। তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, 'হে ইবরাহিম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। নিশ্চয় আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তার পরিবর্তে দিলাম জবাই করার জন্য এক মহান জন্তু'।" [সুরা সাফফাত:১০২-১০৭]*

কিন্তু মিল্লাতে ইবরাহিমের কুরবানী পদ্ধতি ছাড়াও ভিন্ন পদ্ধতি কুরবানীর প্রচলণ হযরত আদম আ. যুগে বিদ্যমান ছিল। হজরত আদম আ. এর দুই সন্তান হাবীল ও কাবীল কুরবানী করেছিল। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে তাদের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

"আর তুমি তাদের কাছে আদমের দুই পুত্রের (হাবীল ও কাবীল) সংবাদ যথাযথভাবে বর্ণনা কর, যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অথঃপর তাদের একজন থেকে গ্রহণ করা হল, আর অপরজন থেকে গ্রহণ করা হল না। সে বলল, 'অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব'। অন্যজন বলল, 'আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের থেকে গ্রহণ করেন'। যদি তুমি আমার প্রতি তোমার হাত প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার জন্য, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হাত তোমার প্রতি প্রসারিত করব না। নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। নিশ্চয় আমি চাই যে, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর, ফলে তুমি দোযখের অধিবাসী হও। আর এটিই হচ্ছে যালেমদের প্রতিদান। সুতরাং তার নফস তাকে বশ করল তার ভাইকে হত্যা করতে। ফলে সে তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পাওে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, 'হায়! আমি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করব'। ফলে সে লজ্জিত হল।" [সুরা মায়েদাহ; ২৭-৩১]

উভয়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা একজনের কুরবানী কবুল করেন। আর অন্য জনের কুরবানী কবুল করেন নি। কারন, যার কুরবানী কবুল করা হয় তার নিয়ত ছিল, আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট ও রাজি করা। এজন্য মিল্লাতে ইবরামির কুরবানীও কবুল হওয়ার মূল শর্ত হল, তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে ইবরাহিম আ. এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

"নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির প্রতিপালক।" [সুরা আনআম; ৬২]

সুতরাং কুরবানী করার মৌলিক উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া তা কবুল হবে না। আর কুরবানী হতে হবে আল্লাহর নামে। নতুবা তা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না এবং তা থেকে কোন উপকৃত হওয়াও হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

" আর তোমরা তা থেকে আহার করো না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি।" [সুরা আল আনআম:১২১]

আর কুরবানী একটি আবশ্যকীয় ইবাদত। যার মাধ্যমে সামর্থবান ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পশু জবাই করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। ইবরাহিম আ. এর এই রীতি অনুসরনে আমাদের নবী সা. নিজেও আল্লাহর রাস্তায় দুম্বা কুরবানী করেন। আর আল্লাহ তায়ালা তার খলীলের আদর্শকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেক সামর্থবান বান্দার উপর আবশ্যক করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানী করুন।" [সুরা আল কাউসার: ২]

ইসলামে শরীয়তে ঈদুল আজহার দিনসমূহে সামর্থবান ব্যক্তির উপর নির্দিষ্ট পশু কুরবানী করা ওয়াজিব। আর আল্লাহ তায়ালা শুধু কুরবানীদাতার অন্তরের নিয়ত যাচাই করেন। বান্দার পশুর যাবতীয় বস্তুর মধ্যে শুধু আল্লাহর কাছে তার তাকওয়া তথা নেক নিয়ত পৌঁছে। আল্লাহ বলেন,

"আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোস্ত ও রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।" [সুরা হাজ্জ; ৩৭]

ফলে পশুর যাবতীয় বস্তু বান্দার জন্যই থেকে যায় এবং তা থেকে আল্লাহ তায়ালা কুরবানীদাতা ও অভাবী, ফকির ও মিসকিনদের সাথে নিয়ে খাওয়ার বৈধতা দেন। আল্লাহ বলেন,

"আর কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি; তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর যখন সেগুলি কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায় তাদেরকে খেতে দাও। এভাবেই আমি এগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" [সুরা আল হাজ্জ: ৩৬]

কুরবানী ইসলামের একটি অন্যতম নিদর্শন ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরবানীর মাধ্যমে যেমন আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয় তেমনিভাবে তা হজরত ইসমাইল আ. এর পরম আত্মত্যাগ ও উৎসর্গকে স্বরণ করে নিজেকে উজ্জীবিত করা যায় এবং পরস্পরে কল্যাণ সাধন, সৌহার্দপূর্ণ আচরণ ও ভ্রাতৃত্বের বাধনকে সুদৃর করা যায়। সুতরাং আমাদের কুরবানী যেন নিছক লৌকিকতা, আত্মম্ভরিতা ও প্রতিযোগিতামূলক রক্তক্ষরণ ও গোশত ভক্ষণ করে ঈদুল আজহার তাৎপর্য ও শিক্ষাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত না করি। বরং আমরা যেন আল্লাহ তায়ালার কাছে একজন আত্মসমর্পণকারী ও আত্মত্যাগী বান্দা হতে পারি এবং তাকওয়া ও আল্লাহভীতির মাধ্যমে কুরবানী আদায় করতে পারি।

লেখক, মুফতী ওয়ালিউল্লাহ তাহসিন
শিক্ষক, লেখক ও গবেষক

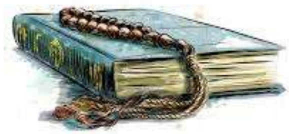

হাদীসের আলো

হজ্বের ফযীলত:

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ করলো এবং অশ্লীল কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকলো, সে ওই দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে হজ্ব থেকে ফিরে আসবে, যেদিন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২১)

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। জিজ্ঞাসা করা হলো এরপর কোনটি? বললেন আল্লাহর পথে জিহাদ করা। বলা হলো, এরপর? তিনি বললেন মাবরুর হজ্ব। (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১৫১৯)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে আরো বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মাবরুর হজ্জের প্রতিদান কেবল জান্নাত।(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১৭৭৩)

হজ্ব এটি ফরজ বিধান: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ্ব ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্ব কর।(সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৩৩৭)

হজ দারিদ্রতা ও গুনাহ সমূহকে দূর করে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা ধারাবাহিকভাবে হজ ও ওমরা কর। কেননা তা দারিদ্রতা ও গুনাহ সমূহকে এমন ভাবে দূর করে দেয়,যেমনিভাবে হাগর লৌহ ও স্বর্ণরুপার ময়লাকে দূরীভূত করে দেয় এবং মকবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। (জামে তিরমিযী, হাদিস নং ৮২১)

অন্য বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তাআলা হজ্ব আদায়কারীর উটনীর প্রতি কদমে একটি নেকি লেখেন কিংবা একটি গুনাহ মুছে দেন। অথবা একটি মর্তবা বুলন্দ করেন।(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ১৮৮৭)

হজ্ব সম্পাদনকারী আল্লাহর প্রতিনিধি:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আল্লাহর পথের মুজাহিদ এবং হজ ও ওমরাকারী হল আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা আল্লাহর ডাকে সাড়া

দেন। আর আল্লাহ ও তাদের প্রার্থনা কবুল করেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৮৯৩)

হজ্বের সফরকারী আল্লাহর দায়িত্বেঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যথা- ১. যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়। ২. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়। ৩. যে ব্যক্তি হজের উদ্দেশ্যে বের হয়।(মুসনাদে হুমাইদী, হাদিস নং ১১২১)

হজের প্রতিদান ব্যয় ও কষ্ট অনুযায়ীঃ

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা তো দুইটি এবাদত নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। আর আমি শুধু একটি নিয়ে ফিরবো? তখন তাকে বলা হল- অপেক্ষা কর। যখন তুমি পবিত্র হবে তখন তানঈমে যাবে এবং (উমরার) এহরাম বাঁধবে। এরপর অমুক স্থানে যাও। অবশ্যই এসবের প্রতিদান হবে তোমার কষ্ট অনুযায়ী। (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১৭৮৭)

হজ্বে যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণকারী কেয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠ করা অবস্থায় উঠবেঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ সওয়ারী থেকে পড়ে তার মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমরা তাকে বড়ই পাতার পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তার কাপড়দুটি দিয়েই তাকে কাফন পরাও। তবে তার মাথা ও চেহারা ঢাকবে না। কেননা কেয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উঠবে।(সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১২০৬)

পরিশেষে, রব্বে কাবা যেন আমাদের সকলকে হজ্জে মাবরুর নসিব করেন এবং হজের সকল ফযীলত অর্জন করার তাওফিক দান করেন। আমীন,ছুম্মা আমীন।

লেখক, মুফতী রহমতুল্লাহ জুবায়ের

শিক্ষাসচিব, মারকাযুত তারবিয়াহ বাংলাদেশ সাভার, ঢাকা।

কোরবানি শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী হাফি.

কোরবানি ইসলামী শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। মুসলমানদের জন্য বিশেষ ইবাদত। কোরবানির বিধান নবী আদম আ. -এর যুগে বিদ্যমান ছিল। ইসলামী শরিয়তে কোরবানির যে পদ্ধতি চালু আছে তা নবী ইব্রাহিম আ. -এর সময় প্রবর্তিত হয়েছিল।

কোরআন এবং হাদিসের আলোকে সামর্থ্যবানদের জন্য কোরবানি করা ওয়াজিব। কারও কারও মতে, সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কোরবানি করা ওয়াজিব, এ বিষয়ে এত বেশি পরিমাণে দলিল প্রমাণ রয়েছে, যা আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র একটি বই রচনার দাবি রাখে। সাহাবি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত- রসুলুল্লাহ সা. মদিনায় ১০ বছর অবস্থান করেছেন, তিনি প্রতি বছর কোরবানি করেছেন (তিরমিজি)।

অপর হাদিসে বর্ণিত রসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'ঈদের দিনে রক্ত প্রবাহিত করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় বনি আদমের কোনো আমল আল্লাহর কাছে নেই। এই কোরবানিকৃত জন্তু কিয়ামত দিবসে তার শিং, পশম ও ক্ষুরসমূহসহ উপস্থিত করা হবে। এর রক্ত জমিনে প্রবাহিত হওয়ার আগেই আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা নিষ্ঠার সঙ্গে, আগ্রহ চিত্তে কোরবানি কর' (তিরমিজি)।

কোরবানি করা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি সুবর্ণ সুযোগ। এই মর্মে আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানি করুন' (সুরা কাউসার-২)। এ আয়াতে মহান প্রভু কোরবানি করার জন্য নির্দেশ করেছেন। নির্দেশ সূচক বাক্য সাধারণত ওয়াজিব বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। মহানবী সা. বলেন, যে কোরবানি করার সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও কোরবানি করবে না সে যেন মুসলমানদের ঈদগাহে না যায় (ইবনে মাজাহ)।
বস্তুত মহানবী সা. -এর এমন কঠোর ধমক কোরবানি ওয়াজিব হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে। অপর হাদিসে মহানবী সা.

বলেন, 'যে ব্যক্তি নামাজের আগে কোরবানি করবে সে যেন নামাজের পর পুনরায় আরেকটি ছাগল জবাই করে' (সহিহ মুসলিম)। কোনো এলাকায় ঈদের নামাজের আগে কেউ কোরবানি করলে বিজ্ঞ ওলামাগণের ঐকমত্যে নামাজের পর পুনরায় তাকে কোরবানি করতে হবে। বস্তুত ওয়াজিব আমল পুনরায় আদায় করতে হয়। ঐচ্ছিক কোনো আমল পুনরায় আদায় করার নির্দেশনা ইসলামী শরিয়তে হয় না।

কোরআন হাদিসের উল্লিখিত উক্তিসমূহের আলোকে জ্ঞানসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর একটি ছাগল-দুম্বা অথবা গরু, উটের সপ্তমাংশ কোরবানি করা আবশ্যক। গরু, মহিষ ও উট কোরবানির ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব সাতজন মিলে কোরবানি করা যাবে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সাহাবি জাবের রা. বলেন, 'আমরা রসুলুল্লাহ সা. -এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার সময়ে উট, গরু সাতজনে মিলে কোরবানি করেছি' (সহিহ মুসলিম)। মুসাফির অবস্থায় কোরবানি করা আবশ্যকীয় নয়। যে ব্যক্তি জিলহজ মাসের ১০ তারিখ সুবহে সাদিকের পর থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সাড়ে সাত ভরি সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপা বা এ পরিমাণ রুপা সমতুল্য নগদ অর্থের মালিক হবে তাকে সামর্থ্যবান গণ্য করা হবে। বর্তমান বাজার মূল্যে সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপার দাম প্রায় সত্তর হাজার টাকা। এ পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় নগদ অর্থ অথবা অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মালিককেও কোরবানি করতে হবে। এ সম্পদ বছর অতিক্রান্ত না হলেও কোরবানি ওয়াজিব হবে।

লেখক ও গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা।

কোরবানির পশুর গুণাবলি

মুফতি উবাইদুল্লাহ তারানগরী

জিলহজ মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফজিলতময় ইবাদত হলো কোরবানি। কোরবানির দিনসমূহে আল্লাহর কাছে কোরবানি ছাড়া অধিক পছন্দনীয় আর কোন আমল নেই। সেদিন বান্দা যত ইবাদতই করুক না কেন কোরবানির সমপরিমাণ সওয়াব অর্জন করতে পারবে না। পশুর ওজনে সওয়াব, পশম পরিমাণ নেকি, রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই রবের দরবারে পৌঁছে যাওয়া ইত্যাদিসহ অনেক ফজিলত রয়েছে। কোরবানি সামর্থ্যবান নারী-পুরুষ সবার জন্য অন্যতম একটি ওয়াজিব বিধান। তাই কোরবানির পশু নির্বাচনেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী সবার জানা দরকার।

যেসব পশু দ্বারা কোরবানি করা যায়:

আল্লাহ তায়ালা সুন্দর, তিনি সুন্দর ও উত্তমকে ভালোবাসেন। তাই কবুলের জন্য একনিষ্ঠতার পাশাপাশি কোরবানির পশুও মোটা-তাজা হৃষ্টপুষ্ট, সুন্দর ও উত্তম হওয়া আবশ্যক। আদম আ. পুত্র হাবিলের কোরবানি থেকেও বিষয়টি অনুমেয়। মোট ছয় প্রকার প্রাণী দ্বারা কোরবানি করা জায়েয। আর তা হলো- উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা। যাদের 'বাহিমাতুল আনআম' বলা হয়। অর্থাৎ অহিংস্র চতুষ্পদ জন্তু।

তবে এগুলো দ্বারা কোরবানি জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো গৃহপালিত হওয়া। বন্য হলে কোরবানি জায়েজ হবে না। পশু বন্য বা গৃহপালিত হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে পশুর মা হিসেবে। বাবা হিসেবে নয়। মা যদি বন্য হয় পশুটিও বন্য, মা যদি গৃহপালিত হয় পশুটিও গৃহপালিত বলে গণ্য হবে। বাবা বন্য-গৃহপালিত যাই হোক, ধর্তব্য নয়। (ফতোয়ায়ে শামী: ৫/২২৬)

পশুর বয়সসীমা:

উটের বয়স সর্বনিম্ন ৫ বছর হতে হবে। এক দিন কম হলেও কোরবানি জায়েজ হবে না।

আর গরু-মহিষ কমপক্ষে ২ বছর বয়সের হওয়া জরুরী। আর ছাগল ভেড়া ও দুম্বা ১বছরের হওয়া শর্ত। একদিন কম হলেও কোরবানি জায়েজ হবে না। তবে ভেড়া ও দুম্বার ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় রয়েছে। কোন ভেড়া বা দুম্বা যদি ৬/৭মাসের হয়, আর তা দেখতে এক বছরের ভেড়া বা দুম্বার মত হৃষ্টপুষ্ট মনে হয় তখন তা দ্বারাও কোরবানি করা জায়েয।

কোরবানির পশু কেমন হবে এ সম্পর্কে হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল সা. বলেন, ‘তোমরা চেষ্টা করবে

কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট বয়সের পশু নির্বাচন করতে। যদি না পাও তাহলে ছয় মাসের দুম্বা কোরবানি করতে পার। (মুসলিম)।
বি.দ্র. বছরের হিসাব হবে আরবি মাস অনুযায়ী ৩৫৪ দিনে এক বছর। (ফতোয়ায়ে শামী: ৫/২২৬, ফতোয়ায়ে আলমগীরি:৫/২৯৭)

যে সব পশু দ্বারা কোরবানি জায়েজ নেই

চার ধরনের পশু দিয়ে কোরবানি করা জায়েজ নেই। অন্ধ, রোগা, পঙ্গু এবং আহত। হজরত বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেন, চার ধরনের পশু দিয়ে কোরবানি করা জায়েজ নয়। অন্ধ, রোগা, পঙ্গু এবং আহত।

নাসায়ির বর্ণনায় 'আহত' শব্দের জায়গায় 'পাগল' বলা হয়েছে। গর্ভবতী পশু, শিং ভাঙা, কান কাটা, লেজ কাটা, জিহ্বা কাটা, ওলান কাটা, লিঙ্গ কাটা ইত্যাদি ধরনের পশু দিয়ে কোরবানি করাকে মাকরুহ বলেছেন ফকিহগণ।

কোন পশুতে কতজন শরীক হতে পারবে:

উট, গরু , মহিষে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হয়ে কোরবানি করতে পারবে। ছাগল ভেড়া দুম্বায় একের অধিক শরিকানা চলবে না। হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুদাইবিয়ায় রাসুল সা. এর উপস্থিতিতে গরু ও উট সাত ভাগে কুরবানি করেছি। (ইবনে মাজাহ।)

খাসি দিয়ে কোরবানি:

পাঠা দিয়েও কোরবানি করা জায়েয, তবে খাসি দিয়েই কোরবানি দেওয়া উত্তম। কারণ রাসূল সা. খাসি কোরবানি দিয়েছিলেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. - এর নিকট দু'টি মোটাতাজা সাদা-কালো শিংওয়ালা খাসি ছাগল নিয়ে আসা হ'ল। তিনি দু'টির একটি মাটিতে ফেলে দিলেন এবং বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে জবাই করলেন (ইবনু মাজাহ্ হা/৩১২২; মিশকাত হা/১৪৬১, বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১১৩৮)।

শিক্ষক: জামিয়া ইবনে আব্বাস রা. সামান্তপুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর সিটি।

প্রবন্ধ

কুরবানীর শিক্ষা ও ফজিলত

মুফতি আইয়ুব নাদীম

যেসব আমলের মাধ্যমে খুব সহজে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায়, তার অন্যতম একটি কুরবানী। কুরবানী ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ একটি বিধান। কুরবানী ইসলামের অন্যতম নিদর্শন ও আকর্ষণ। কুরবানীর এই বিধান শুধু এই উম্মতের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সকল নবী ও রাসূলদের শরীয়তে কুরবানী ছিল। যদিও বিধানগত ও পদ্ধতিগত মোটাদাগে অনেকগুলো পার্থক্য ছিল। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, সামর্থ্যবান প্রতিটি নারী-পুরুষের ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

কোরআন ও হাদিসে কুরবানীর গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা তুলে ধরা হলো।

পবিত্র কুরআনে কুরবানী প্রসঙ্গ:

কুরবানী একটি ব্যাপক বিধান:

পবিত্র কুরআন ইরশাদ হয়েছে, 'আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে আল্লাহ তাদেরকে যে চতুষ্পদ জন্তুসমূহ দিয়েছেন তাতে তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ। সুতরাং তোমরা তারাই আনুগত্য করবে আর সুসংবাদ দাও বিনীতদেরকে।'(সূরা হাজ্জ:৩৪)

কুরবানীর সূচনা যেভাবে হয়েছিল:

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, '(এবং হে নবী!) তাদের সামনে আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে পড়ে শোনাও, যখন তাদের প্রত্যেকে একেকটি কুরবানী পেশ করেছিল এবং তাদের একজনের কুরবানী কবুল হয়েছিল, অন্যজনের কবুল হয়নি। সে (দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে) বলল, আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলব। প্রথমজন বলল, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের পক্ষ হতে কুরবানী কবুল করেন।'(সূরা মায়িদা:২৭)

কুরবানীর ঐতিহাসিক ইতিহাস:

পবিত্র কুরআন ইরশাদ হয়েছে, 'অতঃপর সে পুত্র যখন ইব্রাহিমের সাথে চলাফেরা করার উপযুক্ত হলো, তখন সে বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে জবাই করছি। এবার চিন্তা করে বল, তোমার অভিমত কী। পুত্র বলল, আব্বাজী! আপনাকে যার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে আপনি সেটাই করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন।'(সূরা আস-সাফফাত:১০২-১০৪)

কুরবানীর উদ্দেশ্য: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহর কাছে তাদের গোস্ত পৌঁছে না আর তাদের রক্তও না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়াই পৌঁছে। এভাবেই তিনি এসব পশুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন বলে। যারা সুচারুরূপে সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও।'(সূরা হাজ্জ:৩৭)

হাদিসে কুরবানী প্রসঙ্গ:

কুরবানী একটি শ্রেষ্ঠ আমল:

হযরত আয়শা রা. সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'কুরবানীর দিনে আদম সন্তানগণ এমন কোন কাজ করতে পারে না, যা আল্লাহর নিকট রক্ত প্রবাহিত করার (অর্থাৎ কুরবানী করা) চেয়ে বেশী প্রিয় হতে পারে। কুরবানীর পশুর শিং, পশম, এদের ক্ষুরসহ কিয়ামতের দিন (কুরবানীকারীর নেকীর পাল্লায়) এসে হাজির হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহর নিকট মর্যাদাকর স্থানে পৌঁছে যায়। তাই তোমরা সানন্দে কুরবানী করবে।' (তিরমিযী:১৪৯৩)

কুরবানী মিল্লতে ইব্রাহিমের সুন্নত:

যায়েদ ইবনে আরক্বাম রা. সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. -এর সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কুরবানীটা কি? তিনি বললেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহীম আ. -এর সুন্নাত। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি আমাদের জন্য সাওয়াব আছে, হে আল্লাহর রসূল! তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে একটি করে প্রতিদান রয়েছে। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পশমওয়ালা পশুদের ব্যাপারে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, পশমওয়ালা পশুদের প্রতিটি পশমের পরিবর্তে একটি করে নেকী রয়েছে।'(ইবনে মাজা:৩১২৭)

কুরবানী করলে সগিরা গুনাহ মাফ হয়:

হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ফাতিমা রা.-কে বললেন, তুমি তোমার কুরবানীর জন্তু জবেহর স্থানে উপস্থিত থাকো। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অতীতের সবগুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন। ফাতিমা রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এই গুনাহ ক্ষমা হওয়ার বিষয়টি আমাদের জন্য বিশেষত, নাকি সব মুসলমানের জন্য? নবীজি বললেন, আমাদের ও সব মুসলমানের গুনাহ ক্ষমা করা হবে।' (মুস্তাদরাক হাকিম:৭৬৩৩)

কুরবানী জাহান্নামের প্রতিবন্ধক:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাসান রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন,

'যে ব্যক্তি খুশি মনে সওয়াবের আশায় কুরবানী করবে, ওই কুরবানী জবেহকৃত পশু কুরবানীদাতার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে।' (আল মুজামুল কাবির: ২৬৭০)

সামর্থ্যবানের কুরবানী না দেওয়ায় ধমকি:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যার কুরবানীর সামর্থ্য আছে, তবুও সে কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।'(মুস্তাদরাক হাকিম:৭৬৩৯)

কুরবানীর শিক্ষা:

একজন সফল ও প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, যে কোনো বস্তু থেকে কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা। সেই হিসেবে কুরবানী থেকে শিক্ষা কি, তা জানা জরুরি। কুরবানীর অসাধারণ শিক্ষা হলো, কুরবানীর যাবতীয় কার্যক্রম থেকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের শিক্ষা পাওয়া যায়। তা কীভাবে? হ্যাঁ, তাই বলছি। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম হযরত ইব্রাহিম আ. এবং ইসমাইল আ. অবিস্মরণীয় নির্দেশের সাক্ষী হোন। আর তা হল পিতা কর্তৃক পরমপ্রিয় সন্তান কুরবানীর নির্দেশ। কিন্তু এই পাহাড়সমূহ কঠিন নির্দেশকে তাঁরা নিঃশর্ত ভাবে মেনে নিয়েছেন এবং বাস্তবায়নের চূড়ান্ত চেষ্টা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'সুতরাং (সেটা ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল।'(সূরা আস-সাফফাত:১০৩) এছাড়াও কুরবানী থেকে আরো কয়েকটি বড় ধরনের শিক্ষা হল, ইসলামের জন্য ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যেকোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার ও যেকোনো পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করা এবং যাপিত জীবনে সবধরনের আমলে নিয়ত খাঁটি করা ও তাকওয়া অবলম্বনে চেষ্টা সাধনা করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।'(সূরা আস-সাফফাত:১০৫)

এ ছাড়াও পশু কুরবানীর সাথে সাথে মনের পশুকেও কুরবানী করা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মন-মানসিকতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ইত্যাদি মানবীয় ও কল্যাণকর গুণের শিক্ষা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ আমাদের, কুরবানীর যথাযথ শিক্ষা নিয়ে, শরিয়ত নির্দেশিত সত্য, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ব্যক্তিগতজীবন ও সমাজ গঠন করার তৌফিক দান করুন।

মুহাদ্দিস, জামিয়া কাশেফুল উলূম (হাটখোলা মাদ্রাসা), মধুপুর, টাঙ্গাইল

কুরবানির উদ্দেশ্য

আবরার নাঈম

কুরবানী:

কুরবানীর শাব্দিক অর্থ, নৈকট্য লাভ করা। শরীয়তের পরিভাষায় কুরবানী বলা হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আশায় এবং দুনিয়াতে বান্দার উপর আরোপিত বিধান থেকে কুরবানীর করার মাধ্যমে নিষ্কৃতি লাভ করাকে।

কুরবানির উদ্দেশ্য:

কুরবানির উদ্দেশ্য হল আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর ভালোবাসায় নিজেদের প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেওয়া। ইবনে আবী হাতীম রহ. জুরাইজ রহ. হতে বর্ণনা করেন, জাহিলি যুগে লোকেরা তাদের উৎসর্গকৃত পশুর গোশত নিজেরা খাবার জন্য রেখে দিত এবং ওর রক্ত ঘরে ছিটিয়ে দিত। একথা শুনে সাহাবীগন রা.বললেন, তাদের চেয়ে আমাদেরই এরূপ করার অধিকার বেশি। তখন আল্লাহ তাআ'লা নাযিল করলেন, আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। (সূরা হজ্জ-৩৭)।

অর্থাৎ আমাদের জবাইকৃত পশুর গোশত কি'বা রক্ত কোনোটাই আল্লাহর নিকট পৌঁছে না বরং আমাদের অন্তরে কী আছে সেটা আল্লাহর নিকট পৌঁছে। তাই এক্ষেত্রে আমাদের উচিত হলো নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা।

কুরবানী সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা:

তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (সূরা কাউসার-২) এখানে সালাত দ্বারা ঈদুল আজহার সালাত উদ্দেশ্য।এবং 'নহর' অর্থ কুরবানির পশু জবাই করা।

হাদিসে বর্ণিত কুরবানির গুরুত্ব:

মিখনাফ ইবনে সুলাইম রা.থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সা.এর সাথে আরাফায় অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, হে লোক সকল! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপর প্রতি বছর কুরবানী ও আতীরাহ করা কর্তব্য। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন,তোমরা কি জান আতীরাহ কি? আতীরাহ হলো,যাকে লোকেরা রাজাবিয়াহ বলে থাকে। আবু দাউদ রহ.বলেন, আতীরাহ রহিত এবং এর

হাদিসও রহিত। (সুনানে আবু দাউদ-২৭৮৮)

কুরবানী ওয়াজিব নাকি সুন্নত:

এবিষয়ে ঈমামদের মাঝে সামান্য মতপার্থক্য আছে। কতক ঈমাম বলেছেন কুরবানী ওয়াজিব। তাদের দলিল হলো এই হাদিস, হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত,রাসূল সা.বলেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে। (ইবনে মাজাহ-৩১২৩)

তাঁরা হাদিসের ব্যাখ্যা করেন এভাবে-এই হাদিসে সামর্থ্য থাকা সত্বেও কুরবানী না করার ব্যাপারে যে ধমকি এসেছে, তা সাধারণত ওয়াজিব পরিহার করার কারণে হয়ে থাকে। তাই এখান থেকে বুঝে আসে কুরবানী সুন্নত নয় বরং ওয়াজিব।

যারা সুন্নত বলেন তাদের দলিল হলো; নিম্নোক্ত হাদিস-হযরত ইবনে মুসায়্যাব থেকে বর্ণিত,রাসূল সা.এর সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালামা রা.তাকে অবহিত করেছেন, রাসূল সা.বলেছেন,যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন জিলহজ্জের প্রথম দশদিন তার নখ ও কোনো চুল না কাটে। (সুনানে নাসায়ী-৪৩৬২)

সুন্নতের পক্ষে মত পোষণকারীগণ বলেন,যে কাজের নিসবত বা সম্বন্ধ বান্দার ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত সে কাজ ওয়াজিব হতে পারে না। সর্বোচ্চ সুন্নত হবে।

কুরবানির পশু কেমন হবে:

কুরবানির পশু হতে হবে সুস্থ এবং মোটাতাজা। পাশাপাশি গায়ের রঙ হবে কালো বা ধূসর। অন্যগুলো দিয়েও কুরবানী হবে। তবে রাসূল সা. নিজে কালো বা ধূসর বর্ণের প্রাণী জবাই করেছেন। হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূল সা.এমন শিংবিশিষ্ট মোটাতাজা দুম্বা কুরবানী করেছেন যার চোখ, মুখ ও পা কালো বর্ণের ছিল। (সুনানে আবু দাউদ-২৭৯৬)

আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে কুরবানীর সকল বিধিমালা মেনে এবং বিশুদ্ধ নিয়তে কুরবানী করার তাওফিক দান করুন।

লেখক: শিক্ষক, জামিয়া ঈমাম আবু হানিফা রহ.। ভাটারা, গুলশান, ঢাকা।

ঈদুল আযহাঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ

রাইহান উদ্দিন

বছর ঘুরে ত্যাগের বার্তা নিয়ে আবারো আমাদের মাঝে হাজির হলো পবিত্র ঈদুল আযহা। আল্লাহ তায়ালা পাপের আঁধারে ডুবে থাকা এই মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মহাসুযোগ হিসেবে ঈদুল আযহা দান করেছন। ঈদুল আযহার দিনে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য একটি কাজকে আবশ্যক করেছেন, আর সেটি হলো 'কুরবানি'। আরবি 'কুরবান' শব্দটি ফারসী বা উর্দূতে 'কুরবানি' রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ 'নৈকট্য'। তবে পবিত্র কুরআনে কুরবানির বদলে 'কুরবান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদীছে 'কুরবানি' শব্দটি ব্যবহৃত না হয়ে এর পরিবর্তে 'উযহিয়াহ' ও 'যাহিয়া' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর পারিভাষিক অর্থে 'কুরবানি' ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাছিল হয়। প্রচলিত অর্থে ঈদুল আযহার দিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে 'কুরবানি' বলা হয়'। সকালে রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে 'কুরবানি' করা হয় বলে এই দিনটিকে 'ইয়াওমুল আযহা' বলা হয়ে থাকে। কুরবানি মুসলমানদের জন্য একটি ধর্মীয় ইবাদত। যিলহজ্জ মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে এই ইবাদত পালন করতে হয়।

কুরবানির গুরুত্বঃ

কুরবানি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন-হাদীসে যথেষ্ট তাকীদ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা কাওছার এর ২নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর'। কাফির-মুশরিকরা তাদের দেব-দেবী ও বিভিন্ন কবর ও বেদীতে পূজা দেয় এবং মূর্তির উদ্দেশ্যে কুরবানি করে থাকে। তার প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলমানকে আল্লাহর জন্য ছালাত আদায়ের ও তাঁর উদ্দেশ্যে কুরবানি করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা. বলেছেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرِبَنَّ مُصَلاَّنَا 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানি করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'। রাসূলের এই কঠিন হুশিয়ারি-ই প্রমাণ করে কুরবানির গুরুত্ব কতটুকু। এটি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' যা 'সুন্নাতে ইবরাহীম' হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন এবং সাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানি

করেছেন। অতঃপর অবিরত ধারায় মুসলিম উম্মাহর সামর্থ্যবানদের মধ্যে এটি চালু আছে। এটি কিতাব ও সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সু-প্রমাণিত।

কুরবানির তাৎপর্য :

ঈদুল আযহা ইবরাহীম (আঃ), বিবি হাজেরা ও ইসমাঈলের পরম ত্যাগের স্মৃতি বিজড়িত উৎসব। ইবরাহীম (আঃ)-কে আল-কুরআনে মুসলিম জাতির পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে । পিতা-পুত্রের ত্যাগ বিশ্ব মুসলিমের জন্য ত্যাগের মহত্তম আদর্শ। তাই ঈদুল আযহার দিন সমগ্র মুসলিম জাতি ইবরাহীমী সুন্নাত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রাণপণ চেষ্টা করে। কুরবানির স্মৃতিবাহী যিলহজ্জ মাসে হজ্জ উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মুসলমান সমবেত হয় ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত মক্কা-মদীনায়।

আমাদের জীবণে সকল কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত এবং কুরবানি হচ্ছে সেই নিবেদনের একটি প্রতীক। মানুষ কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হ'তে চায়। আল্লাহর জন্য মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে রাযী আছে কি-না সেটাই পরীক্ষার বিষয়। কুরবানি আমাদেরকে সেই পরীক্ষার কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে আল্লাহর পরীক্ষাও ছিল তাই। আমাদেরকে এখন আর পুত্র কুরবানি দেওয়ার মত কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হ'তে হয় না। একটি হালাল পশু কুরবানি করেই আমরা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারি। কুরবানি একটি প্রতীকী ব্যাপার। আল্লাহর জন্য আত্মত্যাগের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কুরবানি শুধু ঈদুল আযহাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা সারা বছরই আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় নিজ সম্পদ অন্য মানুষের কল্যাণে ত্যাগ করতে হবে। এই ত্যাগের মনোভাব যদি গড়ে ওঠে। তবে বুঝতে হবে, কুরবানির ঈদ স্বার্থক হয়েছে, কুরবানি স্বার্থক হয়েছে। নইলে এটি নামমাত্র একটি ভোগবাদী অনুষ্ঠানই থেকে যাবে চিরকাল। আল-কুরআনে আল্লাহ বারবার ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ এবং আমি যা তোমাদের জন্য যমীন হ'তে বের করেছি তার অংশ ব্যয় কর' (বাক্বারাহ ২৬৭)। আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ মানবতার সেবায় ব্যয় করতে হবে। দরিদ্র মানুষের সহযোগিতায় সরকারের পাশাপাশি সকল বিত্তশালী লোককে এগিয়ে আসতে হবে। সারা বছর, সারা জীবন সাধ্যমত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের কথা বিবেচনা করে মানুষকে সাহায্য করতে হবে। চিত্ত আর বিত্তের মিল ঘটানোর জন্যই আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বারবার মানুষকে আহবান করেছেন।

মানবপুত্রের কোন সৎ কর্মই আল্লাহর কাছে কুরবানির দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে অধিকতর প্রিয় নয়। ক্বিয়ামতের দিনে কুরবানির পশুর শিং, লোম আর ক্ষুর সমূহ

নিয়ে হাজির করা হবে। কুরবানির রক্ত মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহর কাছে তার ছওয়াব গ্রাহ্য হয়ে যায়। আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কুরবানিদাতাদের সাবধান করে দিয়েছেন, 'কুরবানির পশুর রক্ত, গোশত কোন কিছুই আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, পৌঁছে কেবল তোমাদের তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি' (হজ্জ ৩৭)। অর্থাৎ কুরবানিদাতা যেন আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই কুরবানি করে। সুতরাং, আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা, ইবরাহীম (আ:) এর পুত্র কুরবানির ন্যায় ত্যাগ-পূত আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করা ও তাঁর বড়ত্ব প্রকাশ করাই কুরবানি প্রকৃত তাৎপর্য।

কুরবানির শিক্ষা:

মানুষ আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করবে, এই শিক্ষাই ইবরাহীম (আঃ) আমাদের জন্য রেখে গেছেন। মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের জন্য ঐ ত্যাগের আনুষ্ঠানিক অনুসরণকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। আর ঈদুল আযহার মূল আহবান হলো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করা। সকল দিক হতে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া। সম্পদের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর মুহাব্বত সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রতি আত্মসমর্পণ করে দেওয়াই হলো ঈদুল আযহার মূল শিক্ষা। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর হুকুমে পুত্র কুরবানি করেছিলেন। মূলতঃ তিনি এর দ্বারা পুত্রের প্রতি ভালোবাসাকে কুরবানি করেছিলেন। আল্লাহর ভালোবাসার চাইতে যে পুত্রের ভালোবাসা বড় নয়, এটিই প্রমাণিত হয়েছে তাঁর আচরণে। আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন। আর এটাই হলো প্রকৃত তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। আজকে ইবরাহীমী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পশু কুরবানির সাথে সাথে আমাদের দৃপ্ত শপথ নিতে হবে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জান, মালসহ যেকোন ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা প্রস্তুতত আছি। আর এটিই হ'ল কুরবানির শিক্ষা। ইবরাহীম (আঃ) সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন, হয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ ঘোষিত মানবজাতির ইমাম। তিনি মানবজাতির আদর্শ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালের ভয় কর তাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' (মুমতাহিনা ৪-৬)। পরিশেষে আমাদের ছালাত, কুরবানি, জীবন-মরণ সবকিছু আল্লাহর জন্যই উৎসর্গ হৌক, ঈদুল আযহায় মহান প্রভুর নিকট এই থাকুক প্রার্থনা।

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা,টঙ্গী
(অনার্স ১ম বর্ষ)

শ্রমের সঠিক মূল্য দেওয়া

রতন বসাক

শ্রম অর্থাৎ কাজ, যাঁরা কাজ করে তাঁদের শ্রমিক বলা হয়। শ্রম বীনা কোন কিছুই উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। এই শ্রমই প্রত্যেকটা প্রাণীকে তাঁর চাহিদা পূরণ করতে সহায়তা করে। অতি ক্ষুদ্র প্রাণী থেকে বিশাল বড় প্রাণী সবাইকে শ্রম করতে হয়। শ্রম না করে কেউই নিজের সুখ সুবিধা ও চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

আমাদের এই শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য শ্রম করতে হয়। শরীর ভালো থাকলে সবকিছু ভালো লাগে ও যেকোনো কাজ করা যায়। শ্রমের মাধ্যমেই আমরা বিভিন্ন রকম জ্ঞান ও শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। মনোযোগ দিয়ে না করলে কোন কিছুই শেখা যায় না। অলস অর্থাৎ কুঁড়ে মানুষরা কোন সময় জীবনে উন্নতি করতে পারে না। এরা পরের থেকে কিছু পাবার আশায় সব সময় থাকে। নিজে থেকে কোন কাজ করে নেওয়া বা ক্ষমতা এদের থাকে না।

অনেক অনেক যুগ আগে মানুষ একাই সব কাজ করতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ দেখলো যে, একা সব কাজ করা সম্ভব নয়। কাজের শ্রেণীভেদের ফলে সমাজে এক বিশাল পরিবর্তন এলো। বিভিন্ন কাজে মানুষ পারদর্শী হয়ে ওঠায় সমাজে উন্নতি ও অগ্রগতির রেখা বাড়তে লাগলো। মানুষ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আরো বেশি পেতে শুরু করলো। এই সময় মানুষ নির্দিষ্ট সময় ধরে কোন কাজ করতো না, প্রয়োজন অনুসারে তাঁরা কাজ করতো।

এরপর বিভিন্ন সংগঠিত ও অসংগঠিত কর্মসংস্থানের কেন্দ্র গঠিত হওয়ায়, সেখানে মানুষ নির্দিষ্ট সময় অনুসারে কাজ করতে

শুরু করলো। সংগঠিত ক্ষেত্রের ব্যবসায়ী মালিকরা শ্রমিকের থেকে ১২ ঘণ্টারও বেশি কাজ নেবার চেষ্টা করতো। ফলে শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক অবসাদের শুরু হতে থাকলো। নিজের ক্ষমতার চেয়ে বেশি কাজ করায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তুষ্টি এলো। তাঁরা এর প্রতিবাদ করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন শুরু করে দিলো।

সংগঠিত ক্ষেত্রে সারাদিনে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে বিশ্বের সব শ্রমিকরা অনড় থাকলো। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে কিছু শ্রমিক ৮ ঘণ্টার দাবিতে ধর্মঘট করে আন্দোলন শুরু করে। তাঁদের ঘিরে থাকা পুলিশের ওপর কোনো অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বোমা নিক্ষেপ করলে, তখন ১০-১২ জন শ্রমিক ও পুলিশ শহীদ হয়। এইসব শহীদদের স্মরণ করেই প্রত্যেক বছর ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। অনেক বাধা বিপত্তি ও আন্দোলনের পর শ্রমিকদের এই দাবি আন্তর্জাতিক স্তরে মানতে বাধ্য হলো। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে সন্তুষ্টি আসায় তাঁরা আরো ভালো কাজ করার জন্য মনোবল পেলো।

বিশ্বের অনেক স্থানে কর্ম সংস্থানের তুলনায় শ্রমিক সংখ্যা বেশি হওয়ার ফলে, কর্ম সংস্থানের পরিমান কমতে থাকায়, কর্মক্ষেত্রের মালিক তার সুযোগ নিচ্ছে। তাঁরা বাধ্য করছে শ্রমিককে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করাতে একদিনে। মাত্র ৮ ঘণ্টার মজুরী দিয়ে তাঁরা ১২ ঘন্টা ও তার বেশি কাজ শ্রমিকদের থেকে নিচ্ছে। এর কারণে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও মানোবলের অভাব ঘটছে। শ্রমিকরা সুস্থ ও সবল থাকার মতো প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও খাদ্য পাচ্ছে না।

এছাড়া একই কর্মসংস্থান কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে যে, সমকাজে সমবেতন দেওয়াও হচ্ছে না। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটছে। এটা একটা শ্রমিক বিরোধী নীতি এর পরিবর্তন হওয়া উচিত। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কটা ভালো হওয়া দরকার। শ্রমিকের শ্রম অনুযায়ী মালিক যদি বেতন দেয়, তাহলে শ্রমিক ভালো থাকে। আর শ্রমিক যদি ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে তাঁর পুরোটাই দেয়, তাহলে মালিকেরও লাভের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে দেশ ও সমাজে উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

লেখক ও প্রাবন্ধিক

তাকদির

• শেখ সজীব আহমেদ

এক মুসলিম লোকের সঙ্গে যখন তাকদির নিয়ে আমার তর্কবিতর্ক হচ্ছিল তখন আমি এই হাদিসটি বললাম- আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ রা. থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী স্বীকৃত হযরত রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত (শুক্র হিসেবে) জমা থাকে। তারপর ঐরকম চল্লিশ দিন রক্তপিন্ড, তারপর ঐরকম চল্লিশ দিন গোশত পিন্ডাকারে থাকে। তারপর আল্লাহ্ একজন ফেরেশতা পাঠান এবং তাকে রিযিক, মৃত্যু,দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য এই চারটি বিষয় লিখার জন্য আদেশ দেয়া হয়।' (সহীহ্ বুখারী)

এটি বলার পর লোকটি বললেন- এই হাদিস দ্বারা কী বুঝা যায়? আল্লাহ্ যা লিখছেন তাই হচ্ছে।
আমি একটু রাগান্বিত হয়ে বললাম- আরে ভাই, আপনে একটু বুঝতে চেষ্টা করেন।
বোঝাবুঝি দরকার নাই। ভাগ্যে পাপ লেখা আছে বলে পাপ করে যাই। ভাগ্যের লেখা যে, অখণ্ডনীয়। তাহলে পাপ করলে দোষ কেনো হবে? ভাগ্যে যদি জান্নাত লেখা থাকে তাহলে জান্নাতে যাব। আর জাহান্নাম লেখা থাকলে জাহান্নামে যাব। তওবা করলে যেহেতু পাপ মাফ হয়ে যায়, তাহলে মরণের আগ পর্যন্ত পাপ করতে থাকি। তাহলে সমস্যা কী?

আমি একটু ঠাণ্ডা মাথায় তাকে বললাম-
একটু বিবেচনা করা উচিত, কোন মুসলিম ভাইয়ের এসব ধারনা করা ঠিক না।
আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে- হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, 'একবার আমরা তাকদির সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করছিলাম, এমন সময়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের কাছে আগমন করলেন। তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। তার চেহারা মোবারক এমন লাল হয়ে গেল যে,তার দুই গালে যেন বেদানার নিংড়ানো রস মেখে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এ বিষয়েই কি তোমরা নির্দেশিত হয়েছ? আর আমি কি এ নিয়েই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তীরা যখন এ বিষয়ে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদের কঠোরভাবে বলছি, তোমরা এ নিয়ে আর
তর্কাতর্কি করবে না।' (তিরমিজি)

এই হাদিসটি না জানার কারণে, আপনার মতো কিছু মুসলিম ভাইয়েরা ভাগ্য নিয়ে তর্কাতর্কি করে থাকে। কাজ-কর্ম বন্ধ করে দিয়ে যদি ঘরে বসে থাকি, তাহলে কী আমাদের সংসার চলবে? যদি মনে করি ভাগ্যে রিযিক থাকলে এভাবেই আসবে। পেট বাঁচানোর জন্যে ভাতের চিন্তা করতে হবে না। কী দরকার এতো কষ্ট করার!

তাহলে, যদি কেউ বা শরীরে আঘাত করে তখন তার প্রতি কেনো রাগান্বিত হই? কেনো প্রতিশোধ নিতে যাই। তখন কি তাকে বলতে পারি না? আমি কিছু মনে করিনি, আমার ভাগ্যে ছিল বলেই আমি আঘাত পেয়েছি। সন্তানের পিতা হতে চাইলে কেনো বিয়ে করি? ভাগ্যে থাকলে নারী ছাড়াই সন্তানের বাবা হবো। তা কি সম্ভব? সম্ভব না।

তওবার কথা বলতে গেলে- মানুষের জীবনের কোনো গ্যারান্টি আছে ভাই?

গ্যারন্টি কি দিতে পারব,আমরা আর কতদিন এই দুনিয়ায় বাঁচব? একটু ভেবে দেখি। প্রতিদিন কত মানুষ মারা যাচ্ছে- কেউ অসুস্থ হয়ে কেউ বা দুর্ঘটনায়।

সেই সময়ে তওবা করার সময় নাও পেতে পারি।

হয়তো তওবা করার সময় পাইলাম,তবে তওবা কবুল নাও হতে পারে যদি না থাকে ভাগ্যে লেখা।

আমরা যদি কারো হক মেরে খাই,সে যদি মাফ না করে তাহলে কি তওবা করলে মাফ পেয়ে যাব? মাফ পাব না।

আল্লাহ্ তো সব জানেন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কার জীবনে কখন কী ঘটবে।

এই দুনিয়ায় এসে কী করব না করব সবই তো তিঁনি জানেন।জানেন বলেই তিঁনি আমাদের রিযিক, মৃত্যু সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য লিখেছেন।

আল্লাহ্ লিখছেন বলে আমরা এসব

করতেছি তা না।আমরা এমন কাজ করতে ইচ্ছুক বলেই তিঁনি লিখছেন।

তবে দোয়ার মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে একটা হাদীসটি হলো- হযরত সালমান রা. হতে বর্ণিত, 'হযরত রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, দোয়া ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না।'

(তিরমিজি)

আর আমাদের ভালো-মন্দের বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছেন।আমরা যদি জেনে-শুনে খারাপ কাজ করে ভাগ্যদাতার উপর দোষ চাপিয়ে দিই তাহলে কী হবে?তবে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন নিজেরই করতে হবে।

আল কুরআনে বলা হয়েছে-

আল্লাহ বলেন,'আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না,যে পর্যন্ত তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন না করে।'(সূরা রাদ-১১)

যা হোক, আমাদের কর্মের উপর নির্ভর জান্নাত, জাহান্নাম।ভালো কাজ করলে জান্নাত,

মন্দ কাজ করলে জাহান্নাম। পাপ করলে পাপের শাস্তি পেতে হবেই।ভাগ্যের দোহাই দিয়ে কেউ বাঁচতে পারবে না।

তবে অবশ্যই আমাদের ভাগ্যের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সঠিকভাবে আমল করতে হবে। অবশেষে, লোকটি এসব কথা শুনে চুপ হয়ে গেল এবং বুঝতে পারলেন, ভাগ্য বা তাকদির আসলে কী! তারপর,'আল্লাহ্ ক্ষমা করে দাও, আল্লাহ্ ক্ষমা করে দাও বলতে বলতে চলে গেলন।'

মালদ্বীপ প্রবাসী

বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা

★ জিশান মাহমুদ

বাংলার শেষ নবাব মির্জা মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা ১৭৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার নবাব আলীবর্দি খানের নাতি। নবাব আলীবর্দি খানের কোন ছেলে সন্তান ছিল না। তিন কন্যা ছিল। নবাব আলীবর্দি খান তার বড় ভাই হাজী আহম্মদ এর তিনপুত্রের সাথে নিজের তিন কন্যার বিয়ে দেন। হাজী আহম্মদ এর ছেলে নোজেস মোহাম্মদ এর সাথে বড় মেয়ে ঘসেটি বেগমের, সৈয়দ আহম্মদ এর সাথে মেজ মেয়ে এবং জয়নুদ্দীন আহম্মদের সাথে ছোট মেয়ে আমেনা বেগমের বিয়ে দেন। আমেনা বেগমের দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। বড় পুত্রের নাম সিরাজউদ্দৌলা।

যেহেতু আলিবর্দি খানের কোন পুত্র ছিল না, তাই সিরাজউদ্দৌলা তার নানার কাছে অনেক বেশিই আদর পেত। ১৭৪৬ সালে আলিবর্দি খান মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলে সিরাজউদ্দৌলা তার নানার সঙ্গে যান। আলিবর্দি খানের জীবদ্দশায় সিরাজউদ্দৌলা ঢাকার নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পান। সিরাজউদ্দৌলার সতের বছর বয়সে জানকি রামের সাথে লড়াই হয় এবং সেই লড়ায়ের পর তার নানা আলিবর্দি খান ঘোষনা দেন যে, তার পরবর্তীতে বাংলা, বিহার ও উরিষ্যার মসনদে সিরাজউদ্দৌলা বসবে। এই ঘটনাকে ইতিহাসে যৌব রাজ্যাভিশেষ বলে আখ্যায়িত করা হয়। অবশেষে ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল আলিবর্দি খানের মৃত্যু হলে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার ও উরিষ্যার নবাব নিযুক্ত হন। সিংহাসনে বসে তিনি খেয়াল করেন কোলকাতায় ইংরেজদের প্রাদুর্ভাব বাড়তে শুরু করেছে। সিরাজউদ্দৌলা প্রথমে গৃহ বিবাদ দমন করে ইংরেজদের প্রতিহত করেন। ২৭ মে কাসিম বাজারের দূর্গ অবরুদ করেন, ১৮ জুন কোলকাতা আক্রমণ করেন, ২০ জুন কোলকাতা দূর্গ দখল উমিচাদ ও কৃষ্ণবল্লবকে দরবারে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেন। অতঃপর সেনাপতি মানিকচাঁদের হাতে দূর্গের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে ১২ জুলাই রাজধানীতে ফিরে আসেন। এরপর দিল্লির বাদশা শওকত জং নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে মাদ্রাজের ইংরেজ সরকারের দপ্তর কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভকে প্রধান সেনাপতি করে পাঠান কোলকাতা পুনরুদ্ধার করতে। রবার্ট ক্লাইভ শওকত জং এর সাথে মিত্ররা করার চেষ্টা করে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে শওকত জং এর নবাবগঞ্জ নামক স্থানে যুদ্ধ হয় এবং এ যুদ্ধে শওকত জং মারা যায়। সিরাজউদ্দৌলা মোহন লালের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

১৭৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার একটি সন্ধি হয়, যেটি ইতিহাসে আলিনগর সন্ধি নামে পরিচিত। আলিনগর সন্ধির পর নবাব সেনাপতি মানিকচন্দ্রকে তার অপকর্মের কারনে কারাবন্দী করেন। এতে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও মীরজাফর ভীত হয়ে নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার চক্রান্ত করে। মীরজাফরদের সাথে ইংরেজদের গোপন বৈঠক হয় যা জানতে পেরে নবাব মীরজাফরকে বন্দী করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৩ জুন ইংরেজরা সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করলে নবাব বুঝতে পারলেন সেনাপতি এতে জড়িত আছে। ফলে মীরজাফরকে মাফ করে দিয়ে পবিত্র কুরআন ছুয়ে শপথ করে অঙ্গিকার করে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার।

নবাব রায় দূর্লভ, মীরজাফর, মীর মদন, ইয়ার লতিফ, মোহন লাল ও ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রেকে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ২৩ জুন সকাল থেকে পলাশীর প্রান্তরে নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হন। যুদ্ধে মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায় দূর্লভ ষড়যন্ত্র করে সৈন্য নিয়ে দাড়িয়ে থাকে। দুপুরের দিকে বৃষ্টি আসায় নবাবের সকল গোলাবারুদ ভিজে যায়। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর এই যুদ্ধে পরাজিত হয়। নবাব তার স্ত্রী ও ভৃত্য গোলাম হোসেনকে নিয়ে পদ্মা ও মহানন্দা হয়ে নৌকা যোগে উত্তর অভিমুখে যাত্রা করেন। পশ্চিমাঞ্চলের ফরাসী সৈনিক মসিয়েনাস এর সহায়তায় পার্টনার রামনারায়নের কাছে সৈন্য নিয়ে বাংলাকে রক্ষা করার ইচ্ছা নবাবের পূরণ হল না। ১৭৫৭ সালের ৩ জুলাই খাবার সংগ্রহ করতে এসে সৈন্যবাহিনীর কাছে নবাব বন্দী হন তার স্ত্রী লুৎফুন্নেসা ও চার বছর বয়সী শিশু কণ্যা উম্মে জুহুরা। সৈন্যরা নবাবকে মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দেয়। পরেরদিন মীরজাফরের আদেশে তার পুত্রের তত্ত্বাবধানে মহাম্মদীবেগ নামক ঘাতক নবাবকে হত্যা করে। মুর্শিদাবাদের খোয়বাগে নবাব আলীবর্দি খানের কবরের পাশে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সমাহিত করা হয়।

শ্রীবরদী, শেরপুর

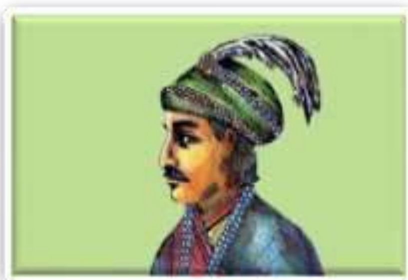

দুনিয়ার সেরা কুৎসিত মহিলা

• ছফওয়ান আল মুসাইব

'মা' একটি ছোট্ট শব্দ। এই শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সব মায়া, মমতা, অকৃত্রিম স্নেহ, আদর, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সব সুখের কথা। চাওয়া-পাওয়ার এই পৃথিবীতে মায়ের ভালোবাসার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা চলে না। মায়ের তুলনা মা নিজেই। চীনের পৌরাণিক একটা গল্প আছে। গল্পটা এমন– এক প্রেমিকা তার প্রেমিক কে পরীক্ষা করার জন্য বলল, 'তোমার ভালোবাসার পরীক্ষা নিতে চাই আমি!' প্রেমিক বলল– 'কি পরীক্ষা নেবে? সব পরীক্ষার জন্য আমি প্রস্তুত।' প্রেমিকা বললথ 'তোমার মায়ের হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে আসো!' প্রেমে অন্ধ ছেলেটি ছুটল মায়ের কাছে! মাকে হত্যা করে তাঁর হৃৎপিণ্ড নিয়ে ছুটল প্রেমিকার কাছে, ভালোবাসার পরীক্ষায় পাস করতে! পথে হঠাৎ আছড়ে পড়ল ছেলেটি। হাত থেকে ফসকে গেল মায়ের তাজা হৃৎপিণ্ডটা! ছেলেটি মায়ের হৃৎপিণ্ড উঠিয়ে হাতে নিতেই তা বলে উঠলথ 'ব্যথা পেলি খোকা?' সন্তান হলো ধারালো চাকুর মতো। সে না চাইলেও মায়ের কষ্ট দেয়। আর মা তার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত সন্তানের সঙ্গে লেগে থাকে। সন্তানের জন্য মায়ের আবেগ অনন্তকালের। অন্যদিকে সন্তানের কাছে মায়ের কোল পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।

তেমনি আজ থেকে দেড়শ' বছর আগে সন্তানদের কথা ভেবে নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে, পৃথিবীর সবচেয়ে 'কুৎসিততম মহিলা' উপাধি পায় এক 'মা'। যিনি তার সন্তানদের লালন-পালন করতে এবং তাদের একটি সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার জন্য অন্যদের উপহাস, অপমান প্রতিদিন সহ্য করে গেছেন। তবে তাঁর লড়াইয়ের এই গল্প দেড়শ' বছরের পুরনো হলেও পৃথিবী থেকে তা আজও ধূসর হয়ে যায়নি। তাঁর জীবন কাহিনী আজও অনেকের কাছে প্রেরণার উৎস।

বলছিলাম মেরি অ্যান বেভানের কথা। যিনি ১৮৭৪ সালে ইংল্যান্ডের নরহ্যামে এক নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই বেড়ে উঠেন তিনি। তাদের পরিবারে তখন মেরি অ্যান সহ আট ভাই বোন। ফলে কম বয়সে রোজগারপাতি শুরু করতে হয় তার। দেখতে হ্যাংলা পাতলা রোগা টাইপের হলেও, সৌন্দর্য্যের কারণে সকলেই তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে যেত। যেটাকে আমাদের

দেশের সোনার ছেলেরা 'প্রথম দেখাতেই ক্রাশ' বলে অভিহিত করে থাকে। তার প্রতিবেশীরা তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন– 'ছিপছিপে রোগা মেয়েটির মুখখানি বেশ চোখ টানে।'

তবে মেরি অ্যানের সে সবের দিকে নজর দেওয়ার সময় ছিল না। তাঁর স্বপ্ন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর একটা বড়সড় সংসার গড়বেন। এক সময় সে সব স্বপ্ন পূরণও হয় মেরি অ্যানের। অল্প বয়সেই নার্সের চাকরি পেয়ে যান। এরপর ১৯০৩ সালে অর্থাৎ ২৯ বছর বয়সে টমাস বিভানকে বিয়ে বিয়ে করে দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। বিয়ের পরে বেশ সুখেই দিন কাটতে ছিল তার। তবে তার এই সুখ-শান্তি বেশি দিন স্থায়িত্ব হলো না।

বিয়ের বেশ কিছুদিন পর থেকে তার নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করল। কখনো মাইগ্রেন, আবার কখনো পেশিতে বা গাঁটে ব্যথা। তবে সে সবকিছু সামলেই সংসার করছিলেন মেরি অ্যান। শারীরিক সমস্যা সত্ত্বেও তাতে নজর দেওয়ার সময় ছিল না মেরি অ্যানের। ইতিমধ্যে চার সন্তানের মা হয়েছেন। ফলে সংসারের কাজেই সব সময় ব্যস্ত।

মাইগ্রেন বা গাঁটে ব্যথার সঙ্গে এবার তার আরও একটি সমস্যা শুরু হয়েছিল। আর তা হলো, মুখের হাড়গোড় অস্বাভাবিক ভাবে বাড়তে শুরু করে। ফলে ধীরে ধীরে মুখ বিকৃত হতে থাকে মেরি অ্যানের। কম বয়সেই তাঁর চেহারা বদলে যায়।

কী অসুখে ভুগছেন? জানতে চিকিৎসকের কাছে ছুটেছিলেন মেরি অ্যান এবং টমাস। পরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানালেন, মেরি অ্যানের অসুখের নাম 'অ্যাক্রোমেগালি'। যা দেহে অতিরিক্ত মাত্রায় হরমোন নিঃসৃত হয়। যার ফলে হাড়গোড়, পেশি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অস্বাভাবিক ভাবে বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে পেশিতে তীব্র যন্ত্রণা এবং মাথাব্যথাও হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টিউমার থাকায় এই সমস্যা দেখা দেয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের উসিলায় আল্লাহ তা'আলা চাহে তো এই রোগ কাটিয়ে উঠা সম্ভব। তবে দেড়শ' বছর পূর্বে 'অ্যাক্রোমেগালি' রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসা ছিল না। ফলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক মুখাবয়ব হারিয়ে ফেলতে শুরু করে মেরি অ্যান। এরই মাঝে হঠাৎ ছন্দপতন। বিয়ের ১১ বছরের মাথায় মারা যান মেরি অ্যানের স্বামী টমাস। চার সন্তানকে নিয়ে অথৈ জলে পড়েন তিনি। সংসার চালাতে আবারও রোজগারের খোঁজে নেমে পড়েন। তবে মেরি অ্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ তাকে কাজ দিত না। বিপরীতে তাকে নিয়ে হাসি তামাশা করতো এবং অপমান করে তাড়িয়ে দিত। চার সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকাই যেন তার কাছে একমাত্র স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ একদিন মেরি অ্যানের নজরে পড়ে খবরের কাগজের একটি বিজ্ঞাপন- দুনিয়ার 'কুৎসিততম' মহিলাদের খুঁজতে ইংল্যান্ডে

একটি প্রতিযোগিতা হচ্ছে। তাতে বিজয় হলে মোটা অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তি হবে। মনস্থির করে ফেলেন মেরি অ্যান। সন্তানদের জন্য তাকে বিজয় হতেই হবে। এক সময় সে প্রতিযোগিতার খেতাবও জিতে ফেলেন মেরি অ্যান।

সন্তানদের কথা ভেবে দুনিয়ার 'কুৎসিততম' মহিলার খেতাবকেই হাতিয়ার করে ফেলেন মেরি অ্যান। ১৯২০ সালে আমেরিকার সার্কাসে কাজের ডাক পান তিনি। তাঁবু খাটানো মঞ্চে উঠে সকলকে হাসাতে হবে! যেমনটা সার্কাসের জোকাররা করে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায় মেরি অ্যান। ইংল্যান্ডের জীবন ছেড়ে জাহাজে করে আমেরিকায় আসেন তিনি।

আমেরিকার মাটিতে পা রাখা মাত্রই মেরি অ্যানকে নিয়ে হইচই শুরু হয়। নিউ ইয়র্কের বহু সংবাদপত্রে 'দুনিয়ার কুৎসিততম মহিলা' শিরোনামে তাঁকে নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

সার্কাসে লোক হাসাতে নিজের চেহারাকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করেছিলেন মেরি অ্যান। সাকার্সে তাঁকে দেখতে ভিড় বাড়তে থাকে। দর্শকেরা তাঁকে দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে। তবে মেরি অ্যানের মানসিক যন্ত্রণার হদিস পাননি কেউ। সন্তানদের বড় করতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই যন্ত্রণা সামলেছেন মেরি অ্যান। 'অ্যাক্রোমেগালি' রোগের বেশির ভাগ রোগীই দীর্ঘজীবী হয় না। মেরি অ্যানও বেশি দিন বাঁচেনি। ১৯৩৩ সালে ৫৯ বছর বয়সে মারা যান তিনি।

আজ আমরা মানুষকে তাদের শারীরিক গঠনের উপর বিচার করি। আমাদের চর্ম চক্ষু যদি দেহের অসুন্দর চেহারার পরিবর্তে তার আত্মার সৌন্দর্য দেখতে পেত, তবে মেরি অ্যান বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হতে পারতেন। আমার চোখে তিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং মা। মায়েরা কখনও অসুন্দর হয়না!

লেখক, ছফওয়ান আল মুসাইব
ঠিকানা, পাংশা, রাজবাড়ী

শাইখুল হাদিস মাওলানা নুরুযযামান সাহেব দা.বা.

নিভৃতচারী এক জ্ঞানসাধকের গল্প

● আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী

'পড়াশোনার চেয়ে আনন্দদায়ক এই পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। তোমরা নিজেদের ভেতর সেই আনন্দটুকু আনার চেষ্টা করবে। আর নিজের ভেতর পড়াশোনার আগ্রহ তৈরি করে জীবনটাকে আনন্দময় করে তোলার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হচ্ছে- আমাদের সালাফ তথা বড়দের জীবনী পড়া। বড়দের জীবনী পড়ার বরকতে নিজের ভেতর বড় কিছু করার আগ্রহ তৈরি হয়। সর্বোপরি নিজের ভেতর পড়াশোনার প্রতি প্রচুর আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আমরা ছাত্রজীবনে প্রচুর পরিমাণে জীবনীগ্রন্থ মুতালায়া (অধ্যয়ন) করতাম। যার ফলে নিজেদের মাঝে পড়াশোনার প্রতি এক ধরনের নেশা অনুভব করতাম। আলহামদুলিল্লাহ, এখনো নিজের মাঝে সে আগ্রহ জাগরুক আছে। পড়াশোনা লেখালেখি ছাড়া অন্য কিছুতে মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পাই না। তোমাদেরকে একটি গল্প শোনাই। প্রায় ৩০ বছর আগের কথা । যাত্রাবাড়ি বড় মাদরাসার লাইব্রেরিতে বসে আছি। হঠাৎ একটি কিতাব সামনে পেলাম। কিতাবটির নাম "তাকরিরে দিলপযীর" । লেখক খ্যাতিমান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসেম নানুতাবী রহ.। কিতাবটি নিয়ে আমি আমার কামরায় চলে আসি। ইশার নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে কিতাবটি পড়া শুরু করি। কিতাবটি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিতাবটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলাম। বেশ কয়েকবার বইটি পড়ে শেষ করলাম। প্রত্যেকবার নতুন নতুন বুঝ ও চিন্তার দিগন্ত নিজের মাঝে উন্মোচিত হতে থাকে। পড়ছি আর পঠিত বিষয়াবলী নিয়ে ভাবছি। হঠাৎ শুনি মসজিদের মাইক থেকে ফজরের আযানের ধ্বনি ভেসে আসছে...'।

গত ১৫ জুলাই (২০২১) ঢাকাস্থ উত্তরার মাদরাসাতুল মুত্তাকীনে একটি ছাত্র সমাবেশে একজন নিভৃতচারী জ্ঞানসাধকের হৃদয়প্রশান্তিকর কথামালা শুনছিলাম বড় মুগ্ধতার সাথে। বলছি উপমহাদেশের খ্যাতিমান আলিমে দ্বীন রাহবারে মিল্লাত, আল্লামা আতহার আলী রহ. এর স্নেহধন্য শাগরিদ, শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ. এর সুযোগ্য খলীফা, বহু বুযুর্গের স্বান্নিধ্যপ্রাপ্ত, নেত্রকোনা জেলার কৃতিসন্তান, প্রচারবিমুখ নিভৃতচারী লেখক ও অনুবাদক, জামিয়াতুস সাহাবা উত্তরা ঢাকার মুহতারাম শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নুরুযযামান সাহেব হাফিযাহুল্লাহু তায়ালা ওয়া আনহুর কথা। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদিসের শিক্ষাদানে নিমগ্ন এই জ্ঞানসাধক মনীষীর জীবনকথা বর্তমান প্রজন্মের অনুপ্রেরণার উৎস।

আজীবন অধ্যয়ন পাগল এই মানুষটি জন্ম গ্রহণ করেন নেত্রকোনা সদরের এক নিভৃতপল্লী কাইলাটি গ্রামে, ১৯৫৬ সালে। পিতা জনাব মরহুম আব্দুর রশিদ সাহেব ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। পেশায় ছিলেন একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। মা বাবার একমাত্র ছেলে মাওলানা নুরুযযামান সাহেব শৈশব থেকেই অত্যন্ত নম্র ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন। কলিজার টুকরো আদরের ধনকে মা বাবা দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষায় শিক্ষিত করে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে মাদরাসায় পাঠিয়ে দেন। বৃহত্তর মোমেনশাহীর প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা ফয়জুর রহমান রহ. এর তত্ত্বাবধানে ১৯৬৮ সালে তিনি ময়মনসিংহের বড় মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসায় হিফযুল কুরআন শুরু করেন। হিফয শেষ হওয়ার কিছুদিন আগেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তার পড়াশোনায় ছেদ পড়ে যায়। প্রায় দু বছর পড়াশোনা বন্ধ থাকার পর ১৯৭৪ সালে নেত্রকোনা জেলার প্রসিদ্ধ হাফেজ সমীরুদ্দীন সাহেব রহ. এর কাছে নেত্রকোনা তাবলীগ মারকাজ সংলগ্ন হিফযখানায় হিফয সম্পন্ন করেন।

হিফয সম্পন্ন করে কিতাব বিভাগের একাডেমিক পড়াশোনা শুরু করেন ময়মনসিংহের জামিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায়। এখানে পড়াশোনা করার সময় তিনি উপমহাদেশের খ্যাতিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা আতহার আলী রহ. এর বিশেষ স্বান্নিধ্য লাভ করেন। মাওলানা নুরুযযামান সাহেব এ সময় আল্লামা আতহার আলী রহ. এর চিঠিপত্রের জবাব লেখার দায়িত্ব পালন করার এক বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেন। মাওলানা নুরুযযামান সাহেব বলেন- আল্লামা আতহার আলী রহ. খেদমত করতে পারা এবং তার সুদৃষ্টি ও দুআ লাভের সৌভাগ্য আমার জীবনের সেরা অর্জন বলে মনে করি।

১৯৭৬ সালে আল্লামা আতহার আলী রহ. এর ইন্তেকাল হয়ে গেলে মাওলানা নুরুযযামান সাহেব জামিয়া আশরাফিয়া খাকডহর ও জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জে পড়াশোনা করেন। অবশেষে ১৯৮৩ সালে তিনি দেশসেরা দ্বীনি শিক্ষাপীঠ জামিয়া আরাবিয়া এমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করে মাওলানা ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময় তিনি বিদগ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হাফিজ সাহেব রহ. শাইখুল হাদিস আল্লামা হাসসান রহ.সহ একদল প্রাজ্ঞ যুগশ্রেষ্ট আলেমের স্বান্নিধ্য লাভ করেন। তার সহপাঠীদের মধ্যে জামিয়া শারঈয়া মালিবাগের শাইখুল হাদিস মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব, খ্যাতিমান লেখক ও গবেষক মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ

ইয়াহইয়া রহ. দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী দা.বা. উল্লেখযোগ্য।

১৯৮৩ সালে মাওলানা নুরুযযামান সাহেব জামিয়া আশরাফিয়া খাকডহর মোমেনশাহীতে মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় সাত বছর আশরাফিয়ায় শিক্ষকতা শেষে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে ঢাকার বিভিন্ন জামিয়ায় তিনি মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ২০০৭ সাল থেকে অদ্যাবধি ঢাকার উত্তর দিকে কহর দরিয়া খ্যাত তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত শাইখুল হাদিস মাওলানা রুহুল আমিন খান দা. বা. প্রতিষ্ঠিত "জামিয়াতুস সাহাবা উত্তরা" ঢাকায় "শাইখুল হাদিস" হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

মাওলানা নুরুযযামান সাহেব একজন ফিতরী মুছান্নিফ তথা স্বভাবজাত লেখক। একজীবনে তিনি প্রচুর লিখেছেন এবং অনুবাদ করেছেন। তার লেখক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েই মূলত আল্লামা আতহার আলী রহ. তাকে নিজের চিঠিপত্রের জবাব লেখার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তার লেখালেখির সূচনা। বিদগ্ধ আলেম লেখক আল্লামা ফরিদ উদ্দিন মাসুদ দা. বা. মাওলানা নুরুযযামান সাহেবের গদ্যশৈলীর প্রশংসা করেন। প্রচুর পরিমাণে লিখলেও তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা একেবারেই কম। তিনি বই প্রকাশের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখাতেন না। ফলে তার অনেক পান্ডুলিপি হারিয়ে যায়। তাছাড়া তিনি তার অনেক রচনা প্রিয় শিক্ষকদের নামেই প্রকাশ করে আনন্দবোধ করতেন। নিজের নামে প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে " তিব্বে নববী" "তিব্বে রুহানী" "ইতিহাসের দুর্লভ তথ্যাবলী", "আহকামে তাবলীগ" ও "ইসলামী তাহযীব" অন্যতম।

আজীবন অধ্যয়নপাগল নিভৃতচারী এই মানুষটির পড়াশোনার আগ্রহ দেখলে রীতিমতো নিজের মাঝে ঈর্ষা জাগে। করোনা ভাইরাসের পুরো লকডাউন তিনি পড়াশোনা করে কাটিয়েছেন। হাফেজ যাহাবী রহ. এর "সিয়ারু আলামিন নুবালা" এর প্রতিটি খন্ড গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন। এখনো তিনি নিয়মিত রাত বারোটা একটা পর্যন্ত "ফতোয়ায়ে কাসিমিয়ার" নির্বাচিত অংশের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখছেন । যেটা মুফতী উবায়দুল্লাহ সাহেব দা.বা. রচিত "জামেউল ফাতাওয়ার" সাথে সংযুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা নিভৃতচারী জ্ঞানসাধক শাইখুল হাদিস মাওলানা নুরুযযামান সাহেব হাফিযাহুল্লাহর সুস্থতার সাথে দীর্ঘ হায়াত কামনা করছি।

আলোচক, গবেষক ও লেখক

সন্তান গড়ার কারিগর মা

→ **আব্দু শুক্কুর**

মা শব্দটি ছোট্ট হলেও এর ব্যাখ্যা করা খুবই জটিল। মা শব্দটির মাঝে লুকিয়ে আছে এক অদৃশ্য মায়ার বিশাল শক্তি। মনের গভীর থেকে মা শব্দটি যেন কোনো এক রজনীগন্ধ্যা সৌরভ ছড়ায় মনে-প্রাণে আর অস্তিত্বে। মা শব্দটাই পারে একটা শিশুকে সকল জটিলতার অবসান ঘটিয়ে জীবন গড়তে। যখন কোনো শিশু ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, তখন তার মনে পড়ে মায়ের কথা। সে জানে এ-সকল বিপদ থেকে তার মা-ই একমাত্র হাতিয়ার যে, তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। তাই শিশুরা যেকোনো বিপদে সবার আগে মাকে স্মরণ করে। মা হচ্ছে এমন একজন চরিত্র যে সন্তানের সুখের জন্য তার সকল সুখ ত্যাগ করেন। মায়ের কাছে একটি সন্তান যেমন তার জগৎ তেমনই সন্তানের কাছে তার মা-ই সব। মা তার পরম মমতার চাদরের উষ্ণতায় সন্তানকে বড় করে তোলেন। সন্তানের জন্য মা সব ত্যাগ স্বীকার করেন, সব কষ্ট সহ্য করেন হাসিমুখে। শত কষ্টের মাঝেও মা তার সন্তানের গায়ে একফোঁটা আঁচড় লাগতেও দেন না।

মা হলো শীতের কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সূর্য । মা হলো সকল চাওয়া পাওয়া পূরণের এক মহাপন্থা। মা হলো সে, যে নিজের অস্তিত্বকে ভুলে সন্তানের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। মা তো সে যে শত অভাবের

মাঝেও সন্তানকে একবারও বোঝতে দেন না যে, তার কত শত অভাব এই ধরায়। তাই তো মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে প্রত্যেক বছর ১২ মে পালিত হয় বিশ্ব মা দিবস। অনেকেই বলেন, মাকে ভালোবাসতে আবার দিবস লাগে নাকি? মায়ের জন্য ভালোবাসা তো প্রতিদিনের। কথাটি ঠিক। মায়ের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নেই। বছরের প্রতিটি দিনই মায়ের জন্য থাকতে হবে হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা। তারপরও বিশেষ একটি দিন উপলক্ষে না হয় মাকে উপহার দিলেন- স্মরণীয় কিছু মুহূর্ত, ছোট্ট কোনো উপহার কিংবা না বলা সেই প্রিয় কথাটি- 'মা তোমাকে ভালোবাসি।'

এখন হয়তো বলতে পারেন, কীভাবে মা দিবস পালন করবো? তাহলে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে আমরা এই মহান দিবসটি পালন করতে পারি। এই বিশেষ দিনে আপনি আপনার মাকে নিয়ে ঘুরতে যেতে পারেন। এমনিতেই মায়েরা সব সময় ঘরে বন্ধি হয়ে থাকেন যদি আপনি আপনার মাকে নিয়ে তার পছন্দের কোনো জায়গায় ঘুরতে যান তাহলে হয়তো আপনার মায়ের মনটা খুবই আনন্দপূর্ণ হবে। আমাদের রোজ রান্না করে যিনি খাওয়ান তিনি হলো মা আর আপনিও এই মহান দিনটিতে মায়ের পছন্দের কোনো খাবার রান্না করে মাকে খাওয়াতে পারেন, এতে তিনি খুবই খুশি হবেন। উপহার দিতে পারেন গহনা, বই, ডায়েরি, শাড়ি ও জুয়েলারি বক্স। ব্যাগ, গৃহসজ্জার উপকরণ ও ফ্রেমে বাঁধান ছবি ছাড়াও পছন্দের যে কোনো কিছু। বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজ, গিফট কর্নারগুলো বিশেষ আয়োজন সাজিয়েছে। পাওয়া যাচ্ছে মাকে নিয়ে লেখা নানা ধরণের উক্তি, কবিতা, বাণী লেখা মগ, বই, পোশাক, ফটোফ্রেমসহ নানাকিছু। মায়ের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিতে পারেন এগুলোও। আবার মাকে চমকে দিতে পারেন শুধু একগুচ্ছ ফুল দিয়েও।

এদিন মায়ের পছন্দের জিনিসগুলো উপহার দিতে পারেন। মায়েরা সবসময় সন্তানদের জন্য সব কিছু কিনে কিন্তু নিজের জন্য তেমন কিছু কিনেন না। তাই আপনি চাইলে এই দিনে আপনার মায়ের জন্য তার পছন্দের জামা কাপড় কিনে উপহার দিতে পারেন। মা দিবস উপলক্ষে আরামদায়ক তাঁত, সুতির পাশাপাশি সিল্ক, মসলিন শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসে। সুতি এবং অ্যান্ডির কম্বিনেশনেও শাড়ি রয়েছে। যারা সালোয়ার-কামিজ পরতে পছন্দ করেন তাদের জন্য রয়েছে হালকা রঙ নকশার ব্লক, সুতা, অ্যাম্ব্রয়ডারি সালোয়ার-কামিজ। অঞ্জন'স, বিশ্বরঙ, রঙ বাংলাদেশ ও আড়ংসহ বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস 'মা' দিবসভিত্তিক থিম নিয়ে তৈরি করেছে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, মগ, ওভাল ও ওয়েস্টার্ন শেপে ক্ল্যাচ ব্যাগ, ফটোফ্রেমসহ নানা কিছু। দেশি দশ, আজিজ সুপার মার্কেট, আর্চিস গ্যালারি, নিউমার্কেটসহ বিভিন্ন মার্কেট, গিফট গ্যালারি এবং বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসে মাকে

উপহার দেয়ার জন্য খুঁজে পাবেন পছন্দমতো নানা কিছু।

যদি আপনি দূরে কোথাও থাকেন তাহলে অন্তত এই দিনটিতে মাকে বেশি করে সময় দিবেন। চেষ্টা করবেন যাতে মায়ের সাথে এদিনে কোনো প্রকার অভিমান না হয়। আর যদি বাসায় থাকেন তাহলে তো ভালোই, আপনি আপনার মাকে জড়িয়ে ধরে বলতে পারেন যে, 'মা তোমায় ভালোবাসি অনেক বেশি ভালোবাসি ' কথাটা বলতে পারেন যা আগে কোনো না কোনো কারণে বলা হয়নি।

মা শব্দটা আসলে শোনতে যেমন লাগে তেমনি এর তাৎপর্য অসীম। মায়েরা হাজারো কষ্টকে হার মানিয়ে তার সন্তানের ভবিষ্যত জীবন নিশ্চিত করতে সর্বদা চেষ্টা করেন।

আমরা অনেকেই মনে করি যে, মা তো মা-ই। তার আবার কি তাৎপর্য বা তার কিসের এতো গুরুত্ব? আসলে ভাই আমরা এমন একটা জাতি যারা কি না আল্লাহকে ভুলে যাই। এখানে মা-তো অনেক দূরের কথা।

যখন কোনো শিশু বা সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন বোঝা যায় মা শব্দটির গুরুত্বপূর্ণ কতটুকু তখন বোঝা যায় যে, মা অর্থটা সত্যিকার অর্থেই কি বহন করে। তাই আমরা যদি ভাবি মা আমাদের কাছে কতটুকু সম্মানের মানুষ, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা উত্তর পেয়ে যাবো।

সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা মাকে কষ্ট দেয়, মাকে সর্বদা আঘাত করে। আসলে তাদের হয়তো আল্লাহ ছাড় দেন, সময় দেন–বোঝার জন্য। কিন্তু আল্লাহ তাদের ছেড়ে দেন না । তারা তাদের জীবদ্দশায় সেই পাপের ফলে ভোগ করেই মরবে।

তাই আসুন আমরা সবাই মাকে একটু হলেও ভালোবাসি। যদি আপনি কাজের চাপে সময় না পান, তাহলে অন্তত মা দিবসে হলেও মাকে একটু সময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তখন আপনার মায়ের মতো সুখী এই দুনিয়ায় আর কেউ থাকবে না। যখন আপনার উপর আপনার মা খুশি হবেন তখন দেখবেন, এই পৃথিবীতে আপনার মতো সুখী আর কেউ নেই।

শিক্ষার্থী: *বাকলিয়া সরকারি কলেজ,চট্টগ্রাম।*

ইব্রাহিম হাসান হৃদয়

যার কবিতার ছন্দে মন ছুটে যায় পল্লী গাঁয়ে। যার লেখা ফুটে ওঠে গ্রাম বাংলার চিরচেনা সেই রূপ তিনি বাংলার কবি, প্রকৃতির কবি, গণমানুষের কবি বন্দে আলী মিয়া।

অসংখ্য কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন তিনি। মা-মাটি-মানুষের প্রতি প্রেম ভালোবাসা ফুটে ওঠেছে তার প্রতিটি লেখায়। গ্রাম নিয়ে তার অমর কবিতা 'আমাদের গ্রাম' পাঠ করলে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে শৈশবে, যেখানে আমাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা।
কবিতা এই লাইন গুলোর সাথে আমরা ছোট বড় সবাই পরিচিত: 'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর/থাকি সেথা সবে মিলে কেহ নাহি পর/পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই/একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
প্রকৃতির প্রতি কবির অকৃত্রিম দরদ ফুটে ওঠেছে তার 'কলমিলতা' কবিতায়: 'বাতাস লাগিয়া দোলে নিরবধি কলমিলতা/পাতায় তাহার মাটির মনের গোপন কথা/বিহানের রোদে টলমল করে বিলের পানি/বুকে ভাসে তার রূপে ডগমগ কলমি রানী।'

প্রকৃতি প্রেমী কবি ১৯০৬ সালের ১৭ জানুয়ারি, পাবনা জেলার রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। বহুমুখী প্রতিভা ছিল তার। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, শিশু সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চিত্রকর ছিলেন। তিনি এক নিম্ন

মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম মুন্সী উমেদ আলী। তিনি পাবনা জজকোর্টে চাকরি করতেন।

বন্দে আলী মিয়া ১৯২৩ সালে পাবনার মজুমদার একাডেমি থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর কলকাতা আর্ট একাডেমিতে ভর্তি হন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি কলকাতা জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি, কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্য লাভ করেন।

বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি তার পালাগান ও নাটিকা রেকর্ড করে বাজারে ছাড়ে। তার প্রায় ২০০ গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ময়নামতির চর, অনুরাগ, পদ্মানদীর চর, মধুমতির চর, ধরিত্রী, অরণ্য, গোধূলী, ঝড়ের সংকেত। শিশুতোষ গ্রন্থ : চোর জামাই, মেঘকুমারী, মৃগপরী, বোকা জামাই, কামাল আতাতুর্ক, ছোটদের নজরুল।

কবি বন্দে আলী মিয়া শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, ১৯৬৭ সালে প্রাইড অফ পারফরম্যান্স পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে রাজশাহীর উত্তরা সাহিত্য মজলিস পদক পান। তিনি মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হন।

আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি প্রিয় কবিকে।
তিনি হাজার বছর বেছে থাকুন তার সৃষ্টিকর্মে।
আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করুন,আমিন।

লেখক ও গবেষক

ফিলিস্তিনে ঈদ আসেনি

মুহাম্মাদ তালহা মাহমুদ

দূর গগণে চাঁদ হেসেছে
বইছে খুশির হাওয়া,
পরিবারে ঈদ কাটাবে
এই তো সবার চাওয়া।

কিন্তু আমি ফিলিস্তিনী
দখলদারের থাবা-
কেড়ে নিলো ভাই-বোন আমার
প্রাণের মা ও বাবা।

ইসরাইলের বুলেট বোমায়
যাচ্ছে ভিটা ঘুরে,
জ্বলছে আগুন ফিলিস্তিনে
ভস্ম গাজা পুড়ে।

ফিলিস্তিনে শান্তি মুখর
ঈদ আসেনি তবে,
মাজলুমী এ ফিলিস্তিনে
ঈদ আসিবে কবে?

ইটের নগর

আব্দুল আহাদ

গ্রামগুলো যে হচ্ছে শহর
ইট পাথরে ঢাকছে নগর
সবুজ লুকিয়ে,
বাংলা গ্রামের শিশু বেলা
মৌমাছি ও দারোগা খেলা
ভুলছে খুকিয়ে।

বক-শালিক ও দোয়েল পাখি
শাপলা বিলের পরশ আঁকি
যায় না দেখা আর,
ইটের নিচে পড়ছে চাপা
পিঠাপুলি শীতের ভাপা
গ্রাম্য বধূ-মার।

পিপীলিকা

মুহাম্মদ নূর ইসলাম

ছয় পায়ে পিল পিল
দল বেঁধে হাঁটে,
রাতদিন তারা শুধু
খাটে আর খাটে।

বাসা বাঁধে একজোটে
একসাথে থাকে,
খাবারের খোঁজ পেলে
সাথীদের ডাকে।

বিপদে আপদে তারা
হয় আগুয়ান,
কোনো কাজে তাদের যে
নেই পিছুটান।

ছোট তারা খুব ছোট
বড় মনোবল,
কারণটা তারা চলে
দল বেঁধে দল।

পিল পিল পিল পিল
হাঁটে পিপীলিকা,
কাজ করে রাতদিন
নেই অহমিকা।

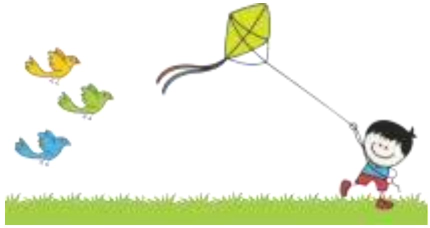

দুষ্টু ছেলে থেকে দূরে থাকা

শাজাহান কবীর (শান্ত)

সুযোগ পেলে পড়ার মাঝে
এই ছেলে দেয় ফাঁকি
ফোন হাতে নেয় ড্রয়ার থেকে
কেউ দেখে না তা-কি?

আব্বু এসে দেখেন বিরাট
ছেলে পড়ার ঝড়,
ফোনটা রেখে পড়ার স্বরে
ভরাট হলো ঘর!

পড়ার কথা মিথ্যা বলে
যে ছেলে দেয় ফাঁকি
এমন ছেলের কাছে থেকে
চলো দূরে থাকি!

কুরবানী

মোহাম্মদ আব্দুর রহমান

ত্যাগ মহিমার বার্তা নিয়ে
কুরবানির ঈদ আসে,
চোখের পাতায় ইবরাহীমের
ওই ইতিহাস ভাসে।

জন্ম-মৃত্যু, সালাত-সিয়াম
সবই রবের জন্য,
কুরবানি হোক মহান রবের
সন্তুষ্টিতে গণ্য।

রক্ত-মাংস কোনো কিছু
যায় না রবের কাছে,
বান্দার শুধু দেখেন তিনি
তাকওয়া কি আছে।

লোক দেখানো, মাংস খেতে
কুরবানি দেয় যারা,
পশুর গলায় মূল্যবিহীন
ছুরি লাগায় তারা।

কুরবানিরই ত্যাগের শিক্ষা
নিতে হবে সবাই,
সবার আগে মনের পশু
দিতে হবে জবাই।

পেটুক মশাই

এম আর মাহফুজ

ঈদের দিনে পেটুক মশাই
বেজায় খুশি হয়।
নানান রকম খাবার খাবে
করবে বিশ্ব জয়।

পোলাও খাবে, কোরমা খাবে,
মিষ্টি, খাবে দই।
বিরিয়ানির গন্ধে বলে
কেমন করে রই।

মাংস খাবে মাছও খাবে
মুরগী খাবে বেশ।
উদর ভরে খাওয়ার পরে
করবে একটু রেশ।

পায়েস খাবে,আয়েস করে
ভোজের নাই তো শেষ।
পাতিলের সব খেলে নাকি
মজা হতো বেশ ।

সোনার দেশ

রুশো আরভি নয়ন

অত্যাচারীর ওই কালো হাত
ফেলরে ভেঙে তরুণ দল,
ঝড়তুফান ওই আসুক যতই
আমরা শক্তি, আমরা বল।

আমরা বারুদ, আমরা বুলেট
ডিঙে বাঁধা সামনে চল,
রাজপথের ওই স্লোগানেতে
সত্য ন্যায়ের কথা বল।

আমরা শান্তি, আমরা সজীব
লড়ে যাব অন্যায়ে,
বুকের ভেতর জ্বলছে আগুন
ঝরছে রক্ত এই গায়ে।

আমরা লড়বো, আমরা গড়বো
এক টুকরো সোনার দেশ,
মুছে যাবে জাতি বিভেদ
সম্প্রীতির বাংলাদেশ।

মনের পশু কোরবানি

গোলাপ মাহমুদ সৌরভ

মনের পশু কোরবানি দাও
লোক দেখানো নহে,
তবেই আল্লাহ খুশি হবেন
শুনো মুমিন ওহে ।

মোটা তাজা পশু জবাই
করতে হবে সবে,
গায়ের রঙটা সুন্দর হবে
তাও বলছে রবে।

আল্লাহর নামে কোরবানিটা
করতে হবে ভাই,
গরীবের হক আদায় করে
পূর্ণ সওয়াব চাই।

হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে
ঈদের নামাজ পড়ি,
বুকের সাথে বুক মিলিয়ে
কোলাকুলি করি।

সেরা কারিগর

নবী হোসেন নবীন

কেউ বানালো রেল গাড়িটা
কেউ বা মোটর গাড়ি,
কেউ বা আবার গড়ে তুলে
আকাশ ছোঁয়া বাড়ি।

উড়োজাহাজ বানিয়ে কেউ
আকাশে যায় উড়ি,
চাঁদের বুকে পা রেখে কেউ
খোঁজে চাঁদের বুড়ি।

সাগর তলে কেউ চলে যায়
ডুবোজাহাজ নিয়ে,
কী জানি ভাই কখন মানুষ
থামবে কোথায় গিয়ে।

কেউ বা আবার আন্তজালে
দেখছে বিশ্ব ঘুরে,
কৃষক বন্ধু লাঙ্গল দিয়ে
নিত্য মাটি খুঁড়ে।

সবার মুখের অন্ন যোগায়
মহান কৃষকবর,
সর্বকালে সবার সেরা
ধানের কারিগর।

ছিন্নমূলের ঈদ

মুহাম্মদ আলম জাহাঙ্গীর

ঈদ এলো ভাই ছিন্নমূলে
লজ্জা শরম সব-ই ভূলে,
সকাল হতে সারি সারি
গোশত টোকায় বাড়ি বাড়ি।

সারাটাদিন গোশত টুকে
কিছু বেঁচে শপিংবুকে,
চাউল লবণ মরিচ কিনে
বাড়ি আসে অশ্রুহীনে।

ছেলে-মেয়ে সবাই বসে
গোশত খায়'রে কসে কসে,
সাধ্যমতো খায়'রে পোলাও
সাথে আবার কোকাকোলাও।

সবার মতো ছিন্নমূলেও
খায় ভরে ভাই হৃদ,
এমনি করে যায় কেটে যায়
ছিন্নমূলের ঈদ।

নিরুদ্দেশ

বিদ্যুৎ মিশ্র

বহুদিন পরে বৃষ্টি নামে পাহাড়ের বুকে,
তারপর সবকিছু ধুয়ে মুছে নতুনের মত
সারি সারি ফুল ফুটে ওঠে নিষিদ্ধ বাগানে।

তাকে দেখেছিলাম সেই ফুটপাথের কোণে,
একটু বেলা গড়িয়ে গেলে যেমন
ব্যস্ততা বেড়ে যায় শহরের রাস্তায়
দিব্যি চেনা মুখগুলো অচেনা হয়ে যায়।

ঠিক সেই মতো চেনা পারফিউম গন্ধে,
পরিচিত মানুষগুলো অনেকটা অচেনা হয়ে
যায়।

আবছা আলোর অন্ধকারে গোমড়া মেঘের
সুর,
অচিন পাখি নিরুদ্দেশ আজ দৃষ্টি বহুদূর
কেউ জানে না কখন কোথায় মেঘ বালিকা
এসে
টাপুর টুপুর বৃষ্টি দিলো একটুখানি হেসে।
জল থৈ থৈ পুকুর ডোবা বৃষ্টি পাতার ডালে

মরিচিকা

মো. আলাউদ্দিন

ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা,আকাশ রাঙ্গা গোধুলি
ঝরে যাবে পুরোনো ফুল,ফুটবে নতুন
কলি।
বেলা শেষে কোনো এক মায়াবী সুতোর
টানে
চলে যাবো সবই ছেড়ে মহান রবের
শানে।

ডুবিছে জীবন-তরী, নাহি ফিরিবার আশা
দুনিয়াতো আমার নয়,এ যে ক্ষনিকের
বাসা।
ছেড়ে যাবো সবকিছু ছিলো যত মায়া
আজ দেখি কেউ নেই শুধু মোর ছায়া ।

এই দুনিয়া যে কিছুই নয় সবই শুধু ধোঁকা
বুঝি আজ সবই ছিলো মিথ্যে মরিচিকা।

শিক্ষার্থী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মশা-মশারি

দিলীপ কুমার মধু

রাতের বেলা খেয়ে দেয়ে মন্টু গেল শুতে,
শোয়ার বেলায় সবার থেকে ও ভারি খুঁতখুঁতে।
বেড সুইচ অফ করে যখন ফেলল নিজের দেহ,
শুনতে পেল গুন্ গুন্ গুন্ করছে যেন কেহ।

ঘন্টাখানেক কায়িক শ্রমে মন্টু নাজেহাল,
এমনি করে চলতে থাকলে আর দেরি নয় সকাল।
মন্টু-মশা ঘুরে ঘুরে মন্টু প্রায় ম'লো,
তার উপরে হাতের তালু লাল টকটকে হলো।

মন্টু বলল–এ হবে না, তাই তো আঁটে ফন্দি
মশা শুদ্ধ মশারিকে ফ্রিজে করবো বন্দী।
খুব সাবধানে মশারিকে ডিপ ফ্রিজে রাখে
মশা কেমন জব্দ হবে সেই ছবিটা আঁকে।

এমন সময় কানের কাছে মশা ভোঁ ভোঁ করে
ফ্রিজের দিকে তাকিয়ে মন্টুর মাথা ভন্ ভন্ করে।
হাত পা ছুড়ে খুঁজতে থাকে কোথায় আমার কাঁথা
কেউ শুনো না, কেউ শুনো না, আমার দুঃখের কথা।

ফেরা

জাহিদুর রহমান আব্দুল্লাহ

ফিরবো বলে কেটে গেছে বহুকাল হয়নি তবু ফেরা,
তোমার কাছে আসবো বলে উপড়ে ফেলেছি শতো বেড়া।
তবু কেন জানি আসতে পারি না তোমার দ্বারে,
অপরাধগুলো রেখেছে আমায় তোমার থেকে দূরে।

ফিরবো বলে যখনই আমি তোমার ঘরে যাই,
ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দুনিয়া এসে ভিড় করে হৃদয়ের জানালায়।
দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে আর হয় না তোলা দুটি হাত,
তাইতো আজ হৃদয় গহীণে এতো ব্যথা-আঘাত!

আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ের চারিপাশ,
তোমার পরশ-ই পারে কেবল করতে তা বিনাশ।
তাইতো সব ফেলে আবার ছুটে এলাম তোমারই ঘরে,
তুলেছি দুটি হাত, ওগো মালিক ফিরিয়ে দিও না মোরে!

তুমি যদি দাও ফিরিয়ে, বলো, যাবো কোথায় আর?
তুমি ছাড়া এতো আপন কে আছে আমার!
কবুল করো ওগো মালিক বান্দার আকুতি,
অশ্রুভেজা নয়নে জানালাম হৃদয়ের আর্জি।

কবিতা একটি স্বপ্নের নাম

মাহমুদ হুজাইফা

আমাকে বলা হলো -
রক্তরাঙ্গা প্রদীপ্ত সূর্য্যের কথা,
যেখানে চন্দ্রের স্নিগ্ধতা নেই,
রৌদ্রদগ্ধ অগ্নির রাজত্বতা।
যেখানে হলদেটে রং রাখালের বাঁশরিতে
ফিরে আসে না নবীন কোন সন্ধ্যা।
চৈত্রের খরা শেষে বাসন্তিক কোকিলের
ঠোঁটে
বয়ে যায় না মৃদুমন্দা।

আমাকে আবারো বলা হলো-
কৃষ্ণচূড়ার লাল তেজে উঠেছে একটি
দিয়াশলাইয়ে।
সেই ঝলক নিয়ে উড়ে গেছে কয়েকশত
কোটি তারকা।
আকাশী বৃক্ষের মতো জবুথবু দেহ,
তবে শক্ত কঠিন তাদের ভূমিকা।
পাঁজরে বুভুক্ষার ছাপ আর উদ্বাস্তু চোখ,
যেনো স্বপ্ন জয়ের কোন পতাকা।

আমি অনিশ্চিত আক্রোশে নিমজ্জিত হয়ে
দেখি-
পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষুব্ধ তান্ডব এসে
কেড়ে নিলে বিতৃষ্ণ রজনী।
একটি গোলাপের পাপড়ি ছুঁয়ে ঝরে পড়ছে
কয়েক ফোঁটা লাল অশ্রু।
সবুজাভ ঘাস, রক্তের লাল একাকার হয়ে
লিখা হলো-
একটি স্বপ্ন জয়ের নাম- বাংলাদেশ।

সেই থেকে রাত্রির শরীরে হাড় কাঁপুনি
শীত এলে,
কিংবা অগ্নি জ্বলন খরার প্রাণশক্তি গ্রীষ্ম
কেড়ে নিলে-
নিদ্রাহীন ক্লান্ত চোখে আমি স্পষ্ট দেখতে
পাই-
স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের, যেনো পূর্ণ
অধিকার চাই।

কিন্তু না।পঁচিশ গেলো, কালো রাত,
ভয়ঙ্কর আলো,ভূতুড়ে পরিবেশ।
মৃত্যুর স্বপ্ন ছাড়া, তারচে' শুদ্ধতম পরশ
ছিলো না পৃথিবীতে অবশেষ।
ছাব্বিশের দীঘল প্রভাত, মহাকাশ ছাপিয়ে
মিটে গেছে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা।
গেয়ে উঠে সমগ্র মহাবিশ্ব চরণ দু'টি,
ভুলে গিয়ে গভীর ক্ষতের ব্যথা।

"মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ
করি।
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র
ধরি।"

জামিয়াতু ইব্রাহিম, সাইনবোর্ড, ঢাকা ।

হারিয়ে যেতে চাই

মানসী খাতুন

হারিয়ে যেতে চাই
যেথায় আলো আসে,
নিকষ কালো আঁধার শেষে
যেথায় রংধনু ওঠে হেসে,
ফুল ফুটে ভালোবেসে।

যেথায় বর্ষা শেষে শরৎ আসে,
মন কুঁকড়ে না দীর্ঘশ্বাসে।

স্মৃতিদের মাখামাখি যেথায়
কুয়াশা,
রোদ্দুর কিংবা গোধূলি বেলায়
হারিয়ে যেতে চাই।
যেথায় দহন শেষে বাদল আসে,
নিজেকে ভালোবাসা যায় অনায়াসে।

তোমার ইচ্ছেগুলো

রথীন পার্থ মণ্ডল

আজও হারিয়ে যাওয়া আমিটাকে
ফিরে পাবার অপেক্ষায় থাকি,
অপেক্ষায় থাকি তোমার ডাকের।

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে
এখনও হেঁটে চলি নির্জন রাস্তায়,
খামে বন্দী সব ইচ্ছেগুলো
সঙ্গী হয় আজও।

রঙিন প্রজাপতি হয়ে
তারাও উড়ে যেতে চায় তোমার কাছে,
তোমার রেখে যাওয়া ইচ্ছেগুলো
পূর্ণতা পায় আমার হৃদয় মাঝে।

জানো শিউলি,
আমার একাকীত্বের আকাশে
তোমার পাওনার ডালিগুলো,
নক্ষত্র হয়ে জ্বলজ্বল করে এখনও।

চলছে ভীষণ খরা

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

গ্রীষ্ম এখন, দেশজুড়ে তাই চলছে ভীষণ খরা
সূর্য্যিমামা সারা দিবস থাকেন ভীষণ কড়া।
এমন করে চললে গরম হিটস্ট্রোকের ভয়
মুখে মুখে শুনছি এমন নানাজনে কয়।

সবাই এখন চাইছে খুবই বৃষ্টি নামুক ভারি
রোদের তাপে দেশের মানুষ করছে আহাজারি!
বৃষ্টি এলে শীতল বায়ু বয়ে যাবে গায়
তাইতো এখন সবাই শুধু বৃষ্টি পেতে চায়।

বৃষ্টি নামুক, বৃষ্টি নামুক, মুষলধারে বৃষ্টি
এই কামনা সবার মনে আকাশ পানে দৃষ্টি।
বৃষ্টি এসে শীতল হাওয়া দিক ছড়িয়ে দেশে
সবাই তাকে করবে বরণ খুশিমনে, হেসে।

মধুমাসে মধুফল

সাঈদুর রহমান লিটন

আম পাকে জাম পাকে মধুমাস এলে
ভাল লাগে খেতে খুব পাকা ফল পেলে।
দেখি যদি পাকা আম মনে দেয় দোলা
পাকা আমে মধু রস যায় নাতো ভোলা।

গাছে গাছে পাকা জাম মিচমিচে কালো
গাছ পাকা কালোজাম খেতে লাগে
ভালো।
জাম খেলে জিবে লাগে কালো কালো কষ
মধুমাসে জামে থাকে ভরপুর রস।

কাঁঠালের ঘ্রাণে ভরে যায় চারদিক
রোয়া খেতে জানো, জিভ করে চিকচিক?
কী দারুণ দেখতে লাগে কাঁঠালের কোষ!
খেতে গেলে আঠা লাগে এই বড় দোষ।

ঝুলে আছে গাছে গাছে, লাল রঙা লিচু
এই দিনে লিচু ছাড়া ভাল্লাগেনা কিছু?
টকটক মিঠে মিঠে আহা লাগে কি স্বাদ!
মধুমাসে খেতে চাই আর সব বাদ।

গণতন্ত্রের ঝলক

রেদওয়ানুল্লাহ

ঘোর অন্ধকারের মাঝে আলোর
প্রতিশ্রুতি।
অন্ধকারের অন্ধকার শাসনের প্রত্যয়দীপ্ত
আশ্বাস।
আমরা বারংবার দেখেছি-
প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের নিগুঢ় বাস্তবতা।

দরিদ্রের দারিদ্র-উন্নতি!
বড়লোকদের মায়া-কান্না!
ধর্ষিতা কন্যা, জায়া, জননীর মুখ!
লম্পটের জেল -মুক্তি -আনন্দ!

ধোঁকা, ধোঁকা এবং ধোঁকার গল্প।
হয়তো ধোঁকা শব্দটিও এখানে লজ্জা পায়!
হলফ,
অন্ধকার ভেদ করে আলোর রেখা কখনোই
আসবে না।

তপন মাইতি

পৃথিবীকে এমন আগে কখনও দ্যাখেনি চাঁদ,
এখনও মাটিতে রক্তাক্ত ক্ষয়াটে জীবন ছাদ।
চৈত্র শেষে হয়না বসন্ত শেষ মন প্রস্তুতির রাত,
আর ওপারে নগর সভ্য প্রথম পাওয়া আলাপ হাত।

পাহাড় থেকে সুন্দরবনে ঘোমটা টানা মাঠের ধান,
খামখেয়ালি ষড়ঋতু মৌসুম হাওয়ায় করছে স্নান।
নির্জন দুপুর ভীষণ একা নীরব নিথর সন্ধ্যা স্থির,
বাদাবন সাঁকোয় পাহাড়ী উচামন উন্নত শির।

ভালবাসার আবেগ উছল রাতে গোলাপ হাতে হাত,
ভাল থেকো ভাল রেখো সবাই সবার ভাতে ভাত।
যে যার তালে থাক্,নদীতে নোঙর করা নৌকা ঠায়,
তারা খসে হায়! ভোগের নৌকা ছয়টি পাল দাঁড়ে বায়।

স্বপ্নের ভেতর বেজে ওঠে অপূর্ব গীটারের সুর,
অনাবিল মৌনতা মাঝে বাজে ভাটিয়ালি দূর।
সবার মাঝে উঠছে দেখো পুব আকাশে সিঁদুর টিপ,
সৃজণ ভোর দেবে উপহার নব উদীয়মান দীপ।

আমার ছেলেবেলা

নূর-ই-ইলাহী

শাপলা ফোটা বিলের শোভা পদ্ম ফুলের মেলা,
কোথায় আছে জৈষ্ঠ্য দুপুর আমার ছেলেবেলা?
বুকের ভেতর খাঁ খাঁ করে দিন গুলোকে পেতে,
আষাঢ় এলো জেগেছে কি রঙধনুদের ফিতে?

কলমি-কচু-হেলেঞ্চা আর কিশোর ছেলের দল,
এখনো কি ডাহুক নদীর জল করে কলকল?
গাছের ডালে পাখ-পাখালি মিষ্টি মধুর চাক,
ভোরের আগে শুনতে পেতাম লালমোরগের ডাক।

সিঁদুর রাঙা মেঘের ফাঁকে বিকেল রোদের হাসি,
সেলিম মামার চালতা আচার আজো ভালোবাসি।
সেলিম মামা এখনো কি চালতা আচার বেচে?
মন্ডল পাগলা এখনো কি দুঃখ নদীই সেচে?
পেটের দায়ে নয়তো সুখে আজ শহরে রই,
ডুব সাঁতারে মেতে উঠা দিনগুলো আজ কই?

অপূর্ব প্রেম

✷ আমাতুল্লাহ ফাতেমা

এক. প্রেমিকের প্রেমকাহিনী বলার ইচ্ছে কিছুতেই আমার পিছু ছাড়ছে না। তাঁর অর্জন-বিসর্জন, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আবেদন-নিবেদন এবং আত্মবলিদানে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত। তার'চে বেশি মুগ্ধ। বেশ কয়েকটি নভেল প্রেম-উপাখ্যানের পাঠক হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। তবে এ প্রেম-উপাখ্যান যেন সবকিছুকে হার মানিয়েছে। প্রভু-প্রেমের অনন্য এ 'প্রেম-কাহিনী' আমার হৃদয় গহীনে ভালোবাসার জোয়ার তুলেছে। ইশক আর মহব্বতের পাক ঝর্ণা প্রবাহিত করেছে। আমার হৃদয়ে উৎসারিত সেই ভালোবাসার কলমেই লেখা তাঁর প্রভু প্রেমের অপূর্ব প্রেম কাহানী।

-প্রিয়র স্বপনে এলো প্রিয়বস্তু বিসর্জনের। প্রিয় বস্তুবলির মাঝ থেকে সবচেয়ে প্রিয়বস্ত কুরবান করলেন করুণাময়ের তরে। তবুও পরদিন স্বপনযোগে একই স্বপ্ন রজনীবেলায় স্বপ্নবেশে এলো। অতঃপর আবারো উক্তস্বপ্ন নেত্রডগায় স্বপ্নবেশে হাজিরায় এলো। এবার প্রেমিক ভাবনা সাগরের গভীরে ভাসছে। কি? কী? কী আমার প্রিয়বস্তু? এমন সময় প্রেমিকের প্রিয় বস্তুখানি তাঁর সামনে গুঁড়িগুঁড়ি পদযুগল ফেলে ঘুরছে। সেঁ ভাবিৎকার। প্রেমিক ভাবিৎকার। প্রেমিকের প্রাণভ্রমর তা প্রত্যক্ষ করছে। কি হয়েছে? কি হয়েছে তাঁর?
তার শ্রদ্ধীয় পিতা ইবরাহীম আ. এর। প্রাণভ্রমর পুত্র ইসমাইল আ. জানতে চাইল তার জনকের জানা। প্রেমিক জনক জানান দেন রজনী স্বপ্ন।

আহ! কেমন ছিলো তখন সে চিত্রে, দৃশ্যে কি ভেসেছিল দু'মন মানচিত্রে? কী জেগেছিল? কেমনে পারলেন প্রেমিকজনক প্রাণভ্রমরকে এমন কিছু বলতে? প্রেমে পড়লে বুঝি প্রেমিক এমনই বেকাকার হয়? _এবার জানি, কি বলেছিলেন জনক তাঁর প্রাণভ্রমর পুত্রকে-

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাকে করতে– জবেহ! অতএব তুমি ভেবে দেখো, তোমার অভিমত কি? কী পরীক্ষা চলছে? একজনের প্রাণ, অপরজনের প্রাণভ্রমর।
তবে সেও ছিলো খলীলুল্লাহরই পুত্র ; স্বয়ং ভাবী পয়গাম্বর। ভাবী পয়গম্বর জানান দিলেন– জনক আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা সেরে ফেলুন।

হায়! এমন কচি বয়স! কেমন অতুলনীয় বিনয়! কেমন আত্মবলিদানের পরিচয়! কেমনে পারলে ভাবী পয়গম্বর? এ অল্প কচিকাঁচায় তুমি পারলে নিজেকে উৎসর্গ করার প্রয়াস? আর আমি!
(ভাবী প্রেমিক, আমার তরে দোয়া রেখো, তোমার ন্যায় আমার পাঁজরে। পরমাণু পরমাণু

পরিমাণ সামান্য হলেও জেনো প্রেম ঠাঁয় পায়। তোমার ন্যায় প্রেম মালা গাথা নাই বা হলো আমার দ্বারা, তবুও জেনো আশার মালা গাথার ভান-ভণিতা করতে পারি।)
জনককে আশ্বাস বাণী শুনালেন পুত্র– ইনশা আল্লাহ! আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্য পাবেন।

–ইয়া সবুর! আমারেও একটু-আধটু সবরের পেয়ালা পিয়ে দিয়ো। অভিশপ্ত তিনবার জনককে প্রতারিত করার চেষ্টায় ছিলো। সাতটি কংকর নিক্ষেপ করে পয়গম্বর অভিশপ্তকে তাড়ালেন।
(এরই অনুসরণে আজও হাজীগণ অভিশপ্তকে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন।)

অবশেষে পয়গম্বরদ্বয় কুরবান গাহে পৌঁছলেন। পিতাকে পুত্র জানান দিল–পিতা! আমাকে শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশি ছটফট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় কাপড় সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না লাগে। অন্যথায়, দেখলে আম্মাজান ব্যাকুল হবেন। ছুরিটা ধার দিয়ে নিন। আমার গলায় দ্রুত চালাবেন। আম্মাজানের কাছে পৌঁছে আমার সালাম জানাবেন। জামা নিতে চাইলে আম্মাজানের কাছে নিতে পারেন, হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন।
উক্ত শব্দরাশি শ্রুত হয়ে জনকের চিত্তে কি ঝড় বয়ে ছিলো? অল্পক্ষণ ভাবুন! একটু ভাবুন! অন্তত এক মিনিট ভাবার অনুরোধ রইল পিতা-পুত্র হৃদচিত্র নিয়ে।

পিতা দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জানান দিলেন, বৎস! তোমার ন্যায় পুরস্কার পেয়ে আমি ধন্য। আল্লাহর নির্দেশ পালনে তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছো।
অতঃপর তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বেঁধে নিলেন এবং তাকে উপর করে বেঁধে নিলেন।

ছুরি চলছে পুত্র গলায়, তবুও কাটছে না পুত্রগণ্ড। পুত্র বলে–আমাকে কাঁত করে শুয়ে দিন। পুত্র স্নেহে হয়তো আপনার তরবারি চলছে না। চলছে ছুরি, কাঁটছে না গণ্ডদেশ। পাগল প্রেমিকের কানে ভেসে এলো–"হে খলীলুল্লাহ! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছো। আল্লাহর অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় তুমি কৃতকার্য! কৃতকার্য হয়েছো। আমি খাঁটি বান্দাদের এমনই প্রতিদান দিয়ে থাকি। প্রেমের প্রতিদানরূপে পুরস্কার নিয়ে হাজিরায় এসেছিলেন জিবরীল আমিন।
করুণাময় এরই নিদর্শন স্বরূপ বিশ্বের ঘরে-ঘরে, দ্বারে-দ্বারে সে পুরস্কারের বার্তা বহাল রেখেছেন। মনুষ্যকুল আজও ইবরাহীম-ইসমাইলী প্রেমের উপাখ্যান স্মরণ করে শ্রদ্ধাভরে প্রতিবছরে ঈদ উদযাপন করে থাকে। আনন্দেরই "ঈদুল আযহা"।
প্রেমের পুকুর পূর্ণ করো,
অন্তর-আত্মায় আশার আলো।
ভালোবাসার প্রদীপ জ্বালাবে,
প্রভু! আমার অন্তরে।

মিরপুর, ঢাকা।

'বিপ্লব' একটি পাখির নাম

শাশ্বত বোস

দিনের এই সময়টা বেশ একটা মধ্যবর্তী ভাব রেখে চলে যায় মনের কোণে। এক আখর বিন্যাসী মেঘ জমতে চাওয়া, নিঃসঙ্গ সন্ধ্যের পূর্বরাগে। জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখতে দেখতে, কেমন যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায় ছেলেটার। প্রবল গ্রীষ্মের বহ্নিশিখা, বাইরেটা পুড়িয়ে ঝাপসা করে দিয়েছে একেবারে। চেতলার এই পুরোনো বাড়িটার মেঝে ছুঁতে চাওয়া। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে পিছনের বাগানের মেহগনী গাছটা।

গাছে সবে নতুন পাতা আসতে শুরু করেছে। ছেলেটি দেখেছে, প্রতি শীতের কোন এক নির্লিপ্ত কালবেলায়, গাছটার সব পাতা ঝরে যায়। খুব ভোরের চোখ কচলানো দৃষ্টিতে, সে দেখেছে গাছটার ছায়া, ছোট হয় এ সময়, আবার ঠিক পোয়াতি বসন্তে, দখিনা বাতাসে দোল দিয়ে, নতুন প্রাণ আসে গাছটায়। তার পেলভিস নিঃসৃত কামরস বেয়ে, শুরু হয় সারিবদ্ধ পিঁপড়ের আনাগোনা। ছোট্ট চড়াইদুটো, বাসা থেকে বেরোয়। ক্রমশঃ বাড়তে থাকা, মোবাইল টাওয়ারের, বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়াকে দুয়ো দেখিয়ে, গাছটা থেকে আকাশে ঝাঁপ মারে। শতাব্দী শোক ভেঙে উড়ে যায়, নরম জীবনের সন্ধানে। ঠিক যেমন, আজ থেকে বছর তিনেক আগে, ছেলেটা জামবনি থেকে কলকাতায় এসেছিলো, কোন এক বৈরাগী বিকেলের শুরুতে, কোন ভালো নাটকের দলের অংশ হতে।

সেই শুরুর দিন থেকে, প্রতিটি সন্ধ্যে সে কাটিয়েছে, কল্লোলিনীর শরীরে উত্তাপ ছড়ানো, চায়ের স্টোভের গলনাঙ্কে ফুটতে চেয়ে। সারাদিন রিহার্সালে, নাটকের দলের ব্যস্ত তারকার, প্রক্সি দেবার পর সে ফিরত এই তেতলার অন্ধকার ছাতের ঘরটায়। দেশ কালের সীমানা ছিঁড়তে চাওয়া, ঘুলঘুলির ফাঁকে তখন সহস্রাধিক এঁটো বাসন, আর মেগা সিরিয়ালের শব্দব্যঞ্জনা। ঠিক যখন, জামবনির পাহাড়ঘেরা ধু ধু তিলের ক্ষেতের হাওয়া, এসে লাগে, ঘর লাগোয়া পুরোনো ছাত টায়। অন্ধকারের ক্লান্তি পেরিয়ে, ধীর পায়ে, ছাতের পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়ায় ছেলেটি। বাড়ির পিছনের দৈত্যাকার গাছটাও তখন এক্কেবারে একা।

আজ বিকেলে তার রিহার্সাল ছিল না। বেলাশেষের এই অখন্ড অবসরে, দপ্তরী মোমের মিছিল, আর ধ্রুপদ সাহিত্য স্মৃতি বুকে করে, ছেলেটা আবার ছাতে এসে দাঁড়াল। গাছটাও যেন, চোখের পাতা না পড়া দৃষ্টিতে, তাকিয়ে আছে ওরদিকে। ঠিক যেমন জামবনিতে, ওদের বাড়ির পিছনে, বিশাল বটগাছটা চেয়ে থাকত, ফুটিফাঁটা এপ্রিলের দুপুরে। দেখতে দেখতে, গাছটার চোখগুলো অল্প আঁচে জ্বলে ওঠে। ঝুড়িগুলো তার গা বেয়ে নেমে এসেছে, যেন সময়ের

কোন অদৃশ্য কোণ থেকে, কালসর্প দোষ ধেয়ে আসছে, হিসেবী রাত্রিবানী বুকে করে। জঙ্গলের ভিতর, করাত কল থেকে ভেসে আসছে, সংস্কারী চৈত্রমাসের, গোত্রহীন যান্ত্রিকতার উপনিষদ। ছেলেটার বাবা ওই করাত কলটায়, দিনে ১০ ঘন্টা খাটতো। হয়ত এক ফাঁকে, পাশের ভাতের হোটেলে ঢুকত, টিফিন করতে। মোটা। চালের পান্তা ভাত,শাকভাজা ও সাথে নুন-লেবু-লঙ্কা। গ্রীষ্ম শুরুর দুপুরবেলায়, সমস্ত জঙ্গল জুড়ে যেন, আগুন লেগে যায়। কচি কলাপাতা রঙের নতুন বৌ, যেন গায়ে হলুদের শাড়িখানা, জড়িয়ে নিয়েছে আপাদমস্তক। অস্বাভাবিক আগুন রঙা, ঢ্যাঙা গাছগুলোর, গোড়ার দিক চওড়া হয় ক্রমশঃ। লাল মাটির বুকে, স্থায়ী সমাধানের মত, উঁইয়ের ঢিবি, এবরো-খেবড়ো, আকারহীন, যেন বসন্ত আর বিষফোঁড়া মেশানো, কোনো দেহাতী লোকের মুখ, এক্ষুনি সাপের মত জিভ বার করবে, এঁকে বেঁকে। ছেলেটি শুনতে পায়, দূর গাঁয়ের মেয়ে-বৌদের, গোল হয়ে গাওয়া পরবের গান।

জঙ্গলের মাঝে একটা প্রাইমারী স্কুল। স্কুলের গা বেয়ে, পাহাড়ের উপর এঁকে বেঁকে উঠে গেছে, পাকা রাস্তা। যেন পৃথিবীর গা বেয়ে, গড়িয়ে যাওয়া, জ্যোতিষ্কের ত্রিদিবী আবেগ। ছেলেটার এখনো মুখে লেগে আছে, এরকম চালচুলোহীন দুপুরে। ভাত দিয়ে মেখে খাওয়া, ওর মায়ের হাতের পোস্তবাটা। আজ এই মুহূর্তে, বিপন্ন বক্ররেখায়, ভিড় করে এসে দাঁড়ায় ওর শৈশব-কৈশে যৌবন। দূরের ওই শহুরে গাছটা যেন, ওকে দেখে, বিশেষ কোনো এক ভঙ্গিমা করতে চায়। এই ভঙ্গিটা ওর চেনা। ওদের গাঁয়ে মুখ বেঁধে আসত, এক দল লোক, পিঠে রাইফেল। কোন এক বিবাদী রাতের ভোরে।

তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওকে। নিজেদের সাথী করেছিল, ওর নতুন নাম দিয়েছিল “কমরেড লাখাই”। লোকগুলো রোজ রাত নামলে, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রামে আসত। কোথাও বাড়ি গিয়ে ভয় দেখাত, কোথাও আবার জনতার দরবারে, চাল ডাল বিলি করত। ওদের কাছে শ্রেণীশত্রু প্রতিপন্ন হলে, তার বিচার ওরা এই জনতার দরবারেই করত। এমনকি আসামীর পরিবারের সামনে, বুলেট পুড়ে দিত, বস্তুবাদী বিপ্লবের শত্রু “বুর্জোয়া” টির বিবস্ত্র, ময়াল শরীরটায়। জোড়হাত মুষ্টিবদ্ধ করে, উপর দিকে ছুড়ে স্লোগান দিত, "লাল সেলাম"। ছেলেটার, লোকগুলোকে খুব খারাপ লাগত না। কারণ, ওরা এই সমাধিস্থ সমাজের, সরীসৃপ নৈতিকতাকে, লন্ডভন্ড করে দেবার কথা বলত।

সমূলদ পরিবর্তন, দিনবদলের ডাক, এই মহাজাগতিক দর্শনগুলো, ক্রমশঃ ছেলেটির চোখের সামনে, নধর চাঁদের মত, অর্ধনারীশ্বর রূপ ধরত। লোকগুলো একটা দল করত, বন্দুক আর বুলেট, যার ক্ষমতার সোপান। ওদের দলের লিডার, ক্রমশঃ হয়ে উঠছিল, এলাকার স্বঘোষিত “রাজা”। এমনই কোন এক, ঘুণ ধরা বিকেলে, লিডার মুন্ডু নিয়েছিল, স্থানীয় জোতদার, জমির দালাল,”মাগলা সারেন” এর। এই মাগলা-ই, কোনদিন ছেলেটির বাপকে, নিজের পায়ের জুতো খুলে মেরেছিল, নিতান্ত সামান্য

অপরাধে। ছেলেটির এই খুনের বিচার, ভালো লেগেছিল সেদিন। মনে হয়েছিল, পুরু চামড়ার তার এই, স্বজাতিগুলোর কাছে, রাষ্ট্রের অনেক ঋণ। এবার বুঝি, তার শোধ নেবার পালা। প্রতিটি মুণ্ডচ্ছেদে, ছেলেটির কানে বেজে উঠত, অপৌরষেয় শঙ্খধ্বনি। যেমনটা টুসুর ভোরে, সে শুনতে পেত, কোপান নদের ধারে। দেশের ভেতর আরেকটা দেশ, একটা সমান্তরাল পৃথিবী। যেখানে মেঘের আলজিভে, ক্ষুধা, লাল হয়ে ঝরে পরে, এই শুকনো জামবনি, আর তার আশেপাশের ইতর অববাহিকায়।

লোকগুলো মাঝে মাঝে, গ্রামে এসে নাটক করত। এই ছেলেটার বয়সী অনেকগুলো ছেলেমেয়েকে একসাথে করে। শহুরে নাগরিকতার কাছে, চিরন্তনী অপাংক্তেয়, গরিব মানুষগুলোর মনে, শ্রেনীবিহীন সমাজ চেতনা গড়ে তোলার জন্য। কখনও ছেলেটি সেই নাটকে, গাছ হয়েছে। উদ্বাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে, কত শত বৈবস্বত কাল ধরে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, তার চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে, হাতের আঙ্গুলগুলো এঁকে বেঁকে গেছে, বৈশাখী বিকেলে, দমকা হাওয়ার, নম্র শরীরী কাব্যের ছন্দ বেয়ে। আজ আবার ছেলেটি, দুটো শীর্ণ হাত তোলে, আকাশের দিকে, সেই বৈদিক জ্যোৎস্নার শূন্যতাকে, দুহাতে ছিড়তে চাওয়া, ভীষণ পূর্ণিমার ধারায়, শরীর ভেজানো, নিঃসঙ্গ ছাতের গা বেয়ে।

গাছটার মগডালে, দুটো শালিক বসে ঝগড়া করছিল, নিজেদের ভেতর। কখনও বনিবনা হয় না ওদের। উড়ে যায় এঁকে অন্যকে ছেড়ে। মাধুরী সন্ধ্যের হাওয়ায়, শহরের আলোগুলোর ওপর, মলত্যাগ করতে করতে, উড়তে থাকে শালিকটি। ওরই নাম হয়তো, কোনোদিন কেউ দিয়েছিল "বিপ্লব"।

জামবনি এবং তৎসংলগ্ন এলাকা, এখন ঠান্ডা পিস্তলের মত, শান্ত নির্জনতায় ডুব দিয়েছে। হয়তো আগুপিছু। আবার বছর তিরিশের জন্য। "দরিদ্র দুপুরের, নাগরিকত্ত্বকে প্রশ্ন ছুড়ে, ধর্মীয় স্লোগান আর মালকোষী তাটে, বাজানো একাদশী চাঁদ হয়তো, আজ বিপ্লবেরই নামান্তর।"

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর,হুগলী

দোয়েল ডাকা দুপুর

★ দ্বিপ্রহর

এক. মেইন গেট থেকে বাসার দরজা পর্যন্ত বেশ প্রশস্ত একটা রাস্তা। বসন্ত এলেই বাড়ির সামনের রাস্তাটা অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। দুপাশের গাছগুলোর পুরনো পাতা ঝরে পড়ে। সেই সাথে শিমুল ও পলাশ ফুলে ঢেকে যায় রাস্তাটা।

বাবা ঘরে প্রবেশ করতে করতে বললেন, রাকা মামনি, রাস্তাটা একটু ঝাড়ু দিতে পারিস না?

রাকা বললো, কদিন পরেই তো আমি চলে যাবো অন্য বাড়ি। তখন এই কথাটা কাকে বলবা প্রতিদিন, শুনি? ফরহাদ সাহেব বললেন, তোকেই বলবো মামনি। তোকে ফোন করে বলবো, ঝাড়ু দিলি না যে রাকা!

কথাটা শেষ হতেই বাবা-মেয়ে অট্টহাসি দিয়ে উঠলো। এর মধ্যে রাকার মা চলে এলেন। তিনি বললেন, সাত সকালে দু'জনে কী শুরু করলে, হু?

মাকে দেখেই রাকা বললো,
– ও মা, বড় আপুকে ফোন করো না! কখন আসবে ওরা?
– ফোন করেছিলাম মাত্র। বললো, ওরা বেরিয়েছে। যা তুই গোসল করে নে। জারিররা কিন্তু দশটার দিকে চলে আসবে।
– কী বলো! এত্তো আগে? আচ্ছা, গেলাম। কথাটা বলে রাকা চলে গেলো ওয়াশরুমে। আজ রাকাকে দেখতে আসবে বরপক্ষ।

ছেলেকে ছবিতে দেখেছে। সুদর্শন। পছন্দ হয়েছে রাকার। সামাজিক আচার অনুযায়ী আজ কনে দেখা হয়ে গেলে সামনের মাসে ওদের বিয়ে। তারপর বাড়িটা পড়ে থাকবে নির্জন। এতো বড় বাড়িতে ফরহাদ সাহেব ও তার স্ত্রী রোজিনা খাতুন বাস করবেন রসহীন। বড় মেয়েটার বিয়ে হয়েছে বছর চার হলো। রাকারও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সাজ্জাদ বেঁচে থাকলে অন্তত শেষ বয়সে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন হতো!

দুই. সাজ্জাদ থাকতো মালয়শিয়ায়। ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে চলে আসার কথা ছিলো। তারপর ধরবে ব্যবসা। ছোট বোনকে বিয়ে দেবে। নিজেও বিয়ে করবে। মা-বাবাকে নিয়ে সুখের দিন পার করবে। কতো কতো স্বপ্ন!

সময়টা জানুয়ারির শেষের দিক। সাজ্জাদকে দেশে চলে আসতে হলো অনিচ্ছায়। তবে বিমানের সিটে বসে নয়। কফিনের ভেতর শায়িত অবস্থায় প্রবেশ করলো মাতৃভূমির সীমানায়। বাড়ি জুড়ে কান্নার রোল পড়ে গেলো।

ঘটনা হলো, রাতে অফিস থেকে ফেরার পর বুকে ব্যথা শুরু হলো সাজ্জাদের। প্রচণ্ড ব্যথায় কাতরাতে শুরু করলো। একপর্যায়ে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো। মিনিট দুই পরে চিরতরে নিথর হয়ে গেলো সাজ্জাদের দেহ। শেষ কথাটাও বলে যেতে পারলো না কাউকে। ফেরা হলো না দেশে। দেখা হলো না পরিবারের সাথে।

তিন. জারির ও রাকা দাঁড়িয়ে আছে বেলকনিতে। দু'জনেই তাকিয়ে আছে সামনের বাগানের দিকে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ঘরে দুই পরিবারের সদস্যরা মত বিনিময় করছে। বিয়ের পরিকল্পনা সাজাচ্ছে। রেইনট্রি গাছের ডালে বসে একটা দোয়েল শিস দিয়ে চলছে সেই কখন থেকে। একটা কাঠবিড়ালি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এডাল থেকে ওডালে। লেবু গাছটায় ফুটে আছে সাদা সাদা ফুল। দুটো প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে ফুলে ফুলে।

দু'জন সেই কখন থেকে চুপ দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। নীরবতা ভেঙে রাকা প্রথম বললো, প্রজাপতি দু'টো কতো সুন্দর!

জারির বাগান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাকার দিকে তাকালো। রাকা তখনো তাকিয়ে আছে লেবু ফুলে উড়ে বেড়ানো প্রজাপতিদের দিকে। মাঠের পর মাঠ সরিষাফুল ফোটার মতো হাসি ফুটে আছে রাকার চোখে মুখে। হালকা রোদ পড়ছে বেলকনিতে। রাকার গায়েও ঝরছে ছোট ছোট রৌদ্রকণা। জারির রাকার দিকে তাকিয়ে আছে একটানা। হঠাৎ দুহাতে চোখ ডলতে শুরু করলো জারির। রাকা একটু ব্যস্ত হয়ে বললো, কী ব্যাপার, চোখে ময়লা গেলো নাকি?

একটু দম নিয়ে জারির বললো, না চোখে কিছু যায়নি। রাকা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে?
মুচকি হেসে জারির বললো, অতিরিক্ত সৌন্দর্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।
রাকা একটু হেসে দুকদম পেছনে সরে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে বললো, একটু বেশি বলে ফেললেন না?

জারির বললো, আমার কাছে বেশি মনে হয়নি।
একটু থেমে আবার বললো জারির, মেঘে ঢেকে গেছে চাঁদ। রাকার কাছে প্রথমে কথাটুকু অস্পষ্ট ঠেকলো। যখন বুঝতে পারলো, কপালে চুল পড়েছে। আর এই কথাটা বোঝাতে এমন উপমার ব্যবহার! তখন একগাল হেসে বললো, আপনি কি কবি টবি নাকি?

-না। তবে অচিরেই কবি হয়ে যাবো হয়তো!
-কেনো?
-এই যে, আপনার সাথে একটু সময় কাটিয়ে কবি কবি ভাব চলে এসেছে নিজের ভেতর। এরপর যখন সবসময় থাকা শুরু করবো আপনার সাথে, তখন তো কবি না হয়ে উপায় থাকবে না।

-কাজের কথায় আসেন। বিশেষ কী বলার আছে আমাকে?

-কপালের চুল সরাবেন, নাকি আমি সরিয়ে দেবো?
– মুখে মুচকি হাসি ধরে রেখে রাকা বললো, ইশ, কী শখ!

কথাটুকু বলেই রাকা দৌড়ে ভেতরের ঘরে চলে গেলো। মেয়েটা ভীষণ লজ্জা পেয়েছে।
জারির বেলকনির গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবনার রাজ্যে গিজগিজ করছে একঝাঁক সুখানুভূতি। তখনো সেই দোয়েলটা ডেকে চলছে। প্রজাপতি দুটো খুনসুটি করছে। মৃদু বাতাসে ঝরছে হলদে পাতা। একটা বিড়াল হেঁটে যাচ্ছে শুকনো পাতার উপর দিয়ে। শুকনো পাতার মরমর ধ্বনি কবিতার ছন্দ তুলছে জারিরের কর্ণকুহরে।

প্রাবন্ধিক, কথাশিল্পী ও কবি
শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর।

জল রঙের জীবন

হাবিবুর রহমান

সকালের ঘুমটা যেন সকল বাঁধা ছিন্ন করেই তার গতিপথ ঠিক রেখেছে আজ। অন্য দিনের মতো আজ সকালের ঘুমটাকে পরাজিত করা গেল না। বসন্তের সকালের ঘুমটা যেন প্রিয় সঙ্গিনীর ছোঁয়া। ছেড়ে যেতে মন চায় না। সঙ্গিনী যেমন পরম আদরে তার প্রিয়কে আলিঙ্গন করে রাখে, ফাল্গুনের সকালটাও যেন আলিঙ্গন করে রেখেছে রায়হানকে। গতরাতে ছাড়পোকা আর মশার শাসন থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পেয়েছে সে। ঝুম বৃষ্টিতে হয়তো পোকাগুলোও তাদের প্রেয়সীর সাক্ষাতে ব্যস্ত ছিলো। তাই অনেকদিন পর একটু শান্তি করেই ঘুমটা হলো তার।

সময় নিজ গতিতে চলে যাচ্ছে। সেদিকে মনোযোগ নেই রায়হানের। পাশেই পড়ে আছে ফোনটা। অথচ জানতে ইচ্ছে করছে না কয়টা বাজে। সময় থেকে দূরে থাকতে চায় সে। কিন্তু সময়কে কি দূরে রাখা যায়! উপেক্ষায় কি রাখা যায় তাকে! জীবনকে সময় বেঁধে রেখেছে তার নিজস্ব গণ্ডিতে, অদৃশ্য গোলকধাঁধাঁয়। সময় থেকে বিচ্যুতি হলেই জীবনের ছন্দপতন ঘটে। যেমনটা আজ ঘটেছে রায়হানের সাথে। শয়তানের কাছে পরাজিত হয়ে।

পাক্কা নামাজি না হলেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করছে সে। তবে বন্ধুদের সাথে আড্ডার আসরে নামাজের সময় হলেও মিস হয়ে যায়। নামাজের প্রতি ভক্তি কম থাকালে যা হয় আরকি। তবে গতকাল রাতে এশার নামাজ পড়ে নিয়ত করেছে ফজরটা মিস দিবে না। কিন্তু ঝুম বৃষ্টি আর মৃদু শীত রূপে শয়তান হাজির হলো তার কাছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামাজটা মিস হয়ে গেছে। দিনটা শুরু করলো শয়তানের কাছে পরাজিত হয়ে।

গত শুক্রবার বড় মসজিদের ইমাম আলোচনা করছিলো ফজর নামাজের ফজিলত সম্পর্কে। কেউ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ইচ্ছে করে ফজরের নামাজ মিস করলে শয়তানের কাছে পরাজিত হয়। ফজরের নামাজ পড়া হলো শয়তানের কাছে যুদ্ধ করার সমান। যে নামাজ ছেড়ে দিলো, সে শয়তানকে জিতিয়ে দিলো। তখনই মনস্থির করেছিল যে ফজরটা নিয়মিত পড়বে। কিন্তু মিস হয়ে গেল আজকে। শুধু নামাজ না, সকাল আটটার ক্লাসও মিস করে বসলো সে। ঘুমের গভীরতার কারণে আরিফের ফোনকলটাও শুনতে পায় নি সে। ক্লাসে যাওয়ার জন্য ফোন দিয়েছিল আরিফ। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে বেলা এগোরাটা বেজে উনিশ মিনিট। গতরাতে বারোটায় ঘুমিয়েছিল। প্রায় বারো ঘন্টা ঘুমিয়েছে সে। মনে হচ্ছে মাথাটা ধরে আছে আর শরীরটাও ব্যথায় বুদ হয়ে আছে। অল্প ঘুম যেমন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তেমনই অতিরিক্ত ঘুমও শরীর ক্ষতি করে, ক্লান্তি নিয়ে আসে। সবকিছু মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম।

ফোন থেকে রুটির চেক করে দেখলো আজ আর ক্লাস নেই। সো লাইব্রেরিতে গেলে মন্দ হয় না। যেই ভাবা সেই কাজ। ফ্রেস হয়ে দুপুরের খাবারটা খেয়ে যাওয়া যাক। নিয়মিত লাইব্রেরিতে না গেলেও মাঝে মাঝে যাওয়া হয়। বিশেষ করে পরীক্ষার আগে। তথাকথিত ভার্সিটি পড়ুয়ারা সারাবছর এদিক সেদিক কাটিয়ে দিলেও পরীক্ষার সময় ঠিকই বই পত্র গুছিয়ে সেন্ট্রাল, সেমিনারের দিকে ছুটে। অনেকে আবার হলের রিডিং রুমে আসন গেঁড়ে বসে। রায়হানের চঞ্চল মন। রিডিং রুমে তার মন বসে না। হুটহাট এটা ওটার বাহানা করে একবার রুমে আসতে পারলেই আর রিডিং রুমে যাওয়ার নাম নেই। ফোনেই ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। রায়হানের পাশের রুমটাই রিডিং রুম। রুমের ওয়াইফাই লাইন রিডিং রুমেও সংযোগ পায়। তাই আজ লাইব্রেরিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। হয়তো একটু মন দিয়ে পড়বে বলে। যেহেতু দিন দশেক পরেই সেমিস্টার ফাইনাল।

রুম থেকে বের হয়ে আরিফকে ফোন দিলো। আরিফ গেলে ভালো লাগবে। একা একা কোথাও যেতে মন সায় দেয় না রায়হানের। আরিফের নাম্বারে রিং হলেও রিসিভ হলো না। হয়তো সকালে রায়হানকে না পেয়ে রাগ করে আছে একটু। সো কি আর করার। একাই যেতে হবে। গুনগুনিয়ে গাইতে লাগলো,

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে, তবে একলা চলো রে! রবীন্দ্র সংগীত হবে হয়তো। এসব আধ্যাত্মিক টাইপের গান ভালো লাগে না তার।

হল থেকে বের হলেই চারিদিকের পরিবেশ পরিস্থিতি নজরে আসে রায়হানের। এক বৃদ্ধা, যে প্রতিদিন হাত পেতে বসে থাকে মেইন গেটের পাশে। সামান্য সাহায্য পাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করে। মন চাইলে পকেট থেকে বের করে কেউ কিছু দেয়, কেউ বা এড়িয়ে যায়। রায়হানের ইচ্ছে হয় খুব করে সাহায্য করতে। কিন্তু সম্ভব হয় না। সে নিজেই ছাত্র। নেই কোন আয়, তবে ঢের খরচ। বাড়ি থেকে টাকা চাইতে লজ্জা লাগে। মাঝে মাঝে কোচিং এ খাতা কেটে বা পরীক্ষায় গার্ডে থেকে কিছু টাকা আসে। তবে তা নিয়মিত না। যতটুকু পারে বৃদ্ধাকে সাহায্য করে পাঁচ টাকা বা দশ টাকা দিয়ে।

এই বৃদ্ধাকে দেখলে তার মায়ের কথা মনে পড়ে। মা-ও তো এমন বৃদ্ধা। গ্রামে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যা পারে ছেলের হাতে তুলে দেয়। সেই ছোট্ট বেলা থেকে ছেলেকে কষ্ট করিয়ে, নিজে খেয়ে না খেয়ে ছেলেকে খাইয়েছে, পড়িয়েছে। স্বার্থ ছাড়া একমাত্র মায়েরাই ভালোবাসতে পারে। মায়ের ভালোবাসা গায়ের ঘামের গন্ধের মতো, যা অদৃশ্য কিন্তু অনুভূতিটা অনেক। সেই ছেলে আজ দেশ সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বৃদ্ধাকে দেখলে মায়ের স্মৃতি জেগে উঠে মনে। বৃদ্ধাকে একটু বেশি-ই ভালো লাগে রায়হানের। বৃদ্ধা নিজেকে সবসময় কালো পর্দার আড়ালে রাখে। কালো বোরকা পড়ে থাকেন সবসময়। এ কারণে বৃদ্ধার প্রতি অন্য রকম শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে।

রাস্তা পার হয়ে ভিসি চত্বরের সামনে বসা মধ্যবয়সী লোকটার দিকে খেয়াল হয়। ওজন মাপার স্কেল নিয়ে বসে আছে। সাইনবোর্ডে লেখা, আমি বৈদ্যতিক শকে আক্রান্ত অসুস্থ ব্যক্তি। নিজের ওজন মেপে আমায় সাহায্য করুন।

এমন কিছু একটা লেখা হবে হয়তো। লোকটা সত্যি নাকি মিথ্যা বলছে তা জানা নাই রায়হানের। দেশে ঠগ বাটপারের অভাব নেই। মানুষের থেকে টাকা আদায়ের কত যে কৌশল তাদের জানা আছে তার হিসাব নেই। এই লোকটা তবু তো ভালো যে, ভিক্ষা করছে না। ভিক্ষা হালাল হলেও নিকৃষ্ট হালাল। মানুষ মরণ প্রাণ অবস্থায় কোন উপায়ন্তর না পেলে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়। আজকাল অনেক সুস্থ, সবল বিবেকহীন হয়ে ভিক্ষা করছে। কাজ করার সামর্থ আছে। অথচ মানুষকে ঠকানোর সহজ পথ খুঁজতে ব্যস্ত তারা। এ লোক তো তবু কাজ করে নিজের, পরিবারের পেট চালাচ্ছে। অসুস্থ হওয়ার সত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি করছে না।

লাইব্রেরিতে গিয়ে সোজা তিনতলায় চলে গেল রায়হান। ঢুকতেই প্রথমে সিট পেয়ে গেল সে। এ সময় লাইব্রেরি অনেকটাই ফাঁকা থাকে। বিকালের এ সময়টাতে অনেকের ক্লাস থাকে, কারও বা টিউশনি। কেউ বা সকাল থেকে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে হলে চলে যায়। তাই এ সময় লাইব্রেরিতে আসলে সিট পেতে কষ্ট পেতে হয় না। তাই রায়হান মধ্যদিনের পরেই লাইব্রেরিতে আসে। তিনতলাটা রায়হানের প্রিয়। সকাল ছয় সাতটায় এসে প্রথম সারির লাইনে দাঁড়িয়েও তিনতলায় চলে যায় সোজা।

ক্লাসের পড়া ভালো লাগে না তার। ক্লাসরুমটা মনে হয় একটা বদ্ধ ঘর, জেলখানা। সিলেবাসেই বন্দী পড়াশোনা। পড়াশোনার কি কোন নির্দিষ্টতা থাকা উচিত? পড়াশোনা হবে উম্মুক্ত। একাডেমিক ভালো লাগে না তার কাছে। তাই তো পরীক্ষার আগের রাতেও পরীক্ষার পড়া বাদ দিয়ে ব্যস্ত থাকে গল্প, উপন্যাস কিংবা ইতিহাসের কোনো পাতায়। সে মুক্ত পাখির মতো উড়তে চায়। জ্ঞানের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় উড়ে উড়ে জ্ঞান আহরণ করতে চায়। প্রকৃতি হবে তার জ্ঞানার্জনের প্রধান মাধ্যম। জানার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা থাকার পরও সে খুলে বসেছে জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' বইটা। আবুলের বৌ মারার কাহিনী আর মন্তু টুনির অপ্রকাশিত ভালেবাসা ভালোই লাগে তার কাছে। তাই বার বার পড়তে ইচ্ছে করে এ বইটা। এ নিয়ে পাঁচ বারের বেশি ছাড়া কম হবে না।

চারিদিকের পরিবেশটা অদ্ভুত। কেউ বা পড়াশোনায় ব্যস্ত, কেউ বা ঘুমে, কেউ আবার কানাকানি হয়ে কথা বলছে একে অন্যের সাথে। লাইব্রেরিতে আসলে ভিন্ন অথচ রোমাঞ্চকর এক অনুভূতি কাজ করে রায়হানের মধ্যে। সব ধরনের শিক্ষার্থীই দেখা যায় এখানে। ফাস্ট ইয়ার থেকে শুরু করে বাপ চাচার বয়সের সবাইকে। ব্যস্ত জীবন সব বয়সের সবাইকে এক সারিতে জড় করেছে। সিনিয়র ভাইদের বয়সের ছাপ স্পষ্ট। চাকরি নেই। নেই পড়াশোনায় বিশ্রামও। ছাত্র জীবনে রাজনীতি করে, মাস্তানি করে কাটিয়েছে সময়। এখন দেয়ালে পিঠ ঠেকলে লাইব্রেরির সিট ছাড়া গতি নেই। হলের রিডিং রুমগুলোরও একই অবস্থা। আমার মতো প্রথম, দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীও দেখা যায় অনেক। তারা এখন থেকেই খুব সচেতন। এলাকার বড় ভাই

আপুদের পরামর্শে বা পরিবারের কথা চিন্তা করে পড়াশোনায় মনোযোগী খুব। হয়তো সে ই পরিবারের একমাত্র ভরসা। পরিবারের সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। ক্যারিয়ার নিয়ে খুব সচেতন। যাতে অন্য সব সিনিয়র ভাই আপুদের মতো আফসোস না করা লাগে।পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরও অসচেতনতার কারণে চাকরি না হওয়া।

ইতোমধ্যে আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। অনেকে লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে মসজিদ মুখী হচ্ছে। রায়হানও নামাজের জন্য লাইব্রেরি থেকে বের হয়েছে। এমনিতেই দিনটা আজ পরাজয় দিয়ে শুরু হয়েছে। আর পরাজিত হতে রাজি না সে। মসজিদের সিঁড়িতে জনাকয়েক শিশু, মধ্য বয়সী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বৃদ্ধা। সেন্ট্রাল মসজিদে আসলেই চোখে পড়ে এসব।
নামাজ শেষে শুরু হয় তাদের আহাজারি।
কিছু খেতে দেন! কিছু সাহায্য করেন!
আরও কত যে তন্ত্র মন্ত্র জানা আছে তার ঠিক নাই। মানুষের করুণা পাওয়ার এ এক বিরাট মাধ্যম। মানুষের করুণা পেতেই কোন পীর দরবার থেকে শিখে আসে এসব তন্ত্র মন্ত্র।

নামাজ শেষে সোজা চলে আসে রায়হান। কাউকে সাহায্য না করেই। তবে দিতে পারলে ভালো লাগতো তার। মায়া হয় তাদের জন্য। কেমন শুকনো মুখ, বিবর্ণ কাপড়ে বসে আছে বাচ্চাগুলো। রাতে খাওয়ার জন্য সামান্যই টাকা আছে তার পকেটে। তাদের দিলে নিজেকে না খেয়ে থাকতে হবে। মাঝে মাঝে নিজেকে খুব স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হতে হয়। না হলে নিজেকে টিকিয়ে রাখা দায়। নিজেকে বাঁচাতেই পৃথিবীতে এতো আয়োজন। নিজেকে বাঁচাতেই তো বৃদ্ধা আত্মসম্মানের মাথা ঘুচিয়ে সাহায্যের জন্য হাত পেতে আছে। অসুস্থ লোকটাও নিজ কাজে ব্যস্ত রয়েছে। শিশুরা তাকিয়ে আছে অন্যের দিকে দুমুঠো খাবারের জন্য। এই জল রঙ্গে আঁকা জীবনের আছে হাজারও রঙ্গের জাল। সেই জালের গণ্ডি অতিক্রম করা মানুষের অসাধ্য। সেই জালেই চাতক পাখির মতো আটকে আছে রায়হান। এক জাল অতিক্রম করলে হাজারও জালে আটকে যায়।

দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

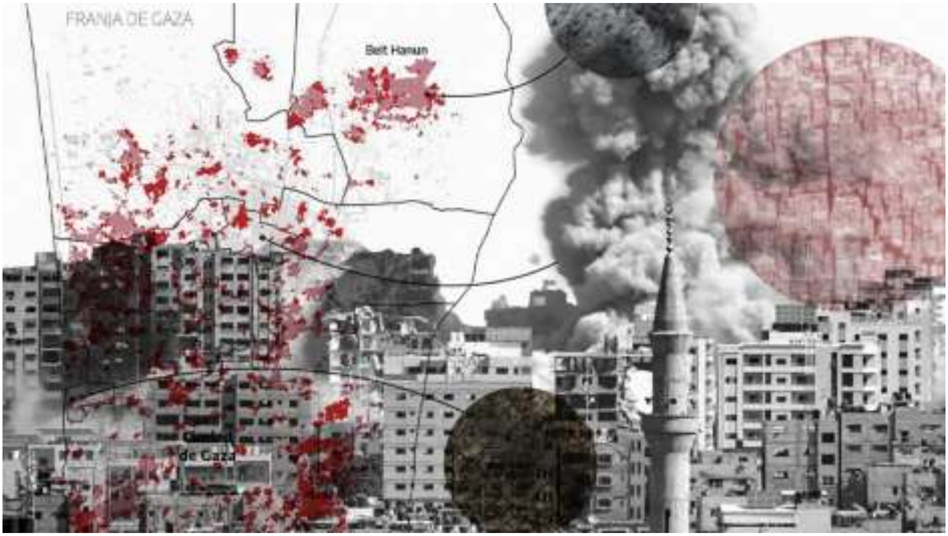

রঙচটা চিরকুট

লাবীব আহমদ

রোজ গাজা উপত্যকার রাফা শরণার্থী শিবিরে, বিভিন্ন ধ্বংসপ্রায় এলাকা থেকে শত সহস্র নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধথ আশ্রয় নিতে ছুটে আসছেথ একটু বেঁচে থাকার মানসে।দু'একদিন পরপরই ইসরাইলি নৃশংস বর্বর হামলায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে, বহু সুখে-সখে গড়ে তোলা মুসলিম বসতি। মাটিতে মিশে যাচ্ছে চিরচেনা অজস্র নগরী। ইসরায়েলের দানবীয় বোমার বীভৎস মিসাইলের তীব্র আঘাতে, মৃত্যুর মুখে আছড়ে পড়ছে নাম জানা-অজানা অসংখ্য আদরের নারী-শিশু অপতুল্য ভালোবাসার মা-বাবা কিংবা সহোদর বন্ধুরা। ভাগ্যের জোরে খোদার করমে বেঁচে যাওয়া বাকি মানুষগুলো তাই জীবনটা বাঁচাতে আশ্রয় নিচ্ছে রাফা সীমানায়।

এইসব আশ্রয়হীনদেরর মাঝে প্রকট আপন একটি মুখের সন্ধানে, কয়েক দিন অন্তর 13 মাইল পথ হেঁটে শরণার্থী শিবিরে ঢু-মারতে আসেন হামাস মুজাহিদ জারির আল আয়মান।

হৃদয়ে একটিই কামনা, প্রিয়ার মুখচ্ছবি এক চিলতে দেখতে পাওয়া। সেই অভিলাসে কখনো জারির এই তাবু বা সেই

তাবুর ফাঁক গলে উঁকি দেয়; এই ভাবনায় "উমামা" এই তাবুতে আছে বোধহয়। কখনো রাস্তার ধারে ব্যাগ নিয়ে বসে থাকা আশ্রয়হীন লোকদের গা ঘেঁসে বসে , ভাব বিনিময় করার ফাঁকে জিজ্ঞেস করেথআচ্ছা আপনি কি উমামা বিনতে সাহিল নামে কাউকে দেখেছেন? কখনোবা কোন যুবকের কাঁধে হাত রেখে মমতার পরশ বুলিয়ে, মুখ কাচুমাচু করে জিজ্ঞেস করে। যুবকদের না সূচক মুখভঙ্গি দেখে, জারিরের মনটা বিষিয়ে ওঠে, তবুও হাল ছাড়ে না। অবিরাম সন্ধান চালিয়েই যায়। কখনোবা পর্দাবৃত ষোড়শী গড়নের নারীদের ডাক দিয়ে বসে উমামা বলে! মাঝেমধ্যে এই কারণে ভর্ৎসনাও শুনতে হয়েছে জারির কে!

কিন্তু মনের কোণে নিভু-নিভু খুঁজে পাওয়ার এক অদম্য ইচ্ছা, অব্যর্থ দুর্বার চেষ্টা আর প্রচেষ্টা জারিরকে থমকে যেতে দেয়নি। উমামাকে পাবেই পাব মনে এই তীব্র বাসনা। এভাবেই বেশ কিছু মাস অতিবাহিত করে ফেলেছে উমামার খোঁজে, জারির আল আইমান। আজও উমামার খোঁজে শরণার্থী শিবিরে এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলো আপন গন্তব্যে। চলতি পথে কতগুলো শিশুর তীব্র পিপাসা আর রেষহীন ক্ষুধার যাতনায় হাউমাউ করে কাঁদা, ওদের বিভিষিকাময় কাতরানো গলাকাটা মুরগির মতো তড়পানো দেখে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারল না হামাস মুজাহিদ জারির আল আয়মান।

রাতের আগাম অভিযানের জন্য নিজের ছোট্ট পুটলিতে জমিয়ে রাখা সামান্য কিছু আধ সেকা রুটি, মাথায় পচন ধরা একমুষ্টি জাইতুন আর দু চারটে শুষ্ক খেজুর ক্ষুধা নিবারণের জন্য শিশুদের হাতে তুলে দিল আর স্বীয় খাদ্যের পুটলি শূন্য করে ক্ষুধার্ত শিশুদের এক চিলতে শুষ্ক হাসি আপন করে অবশেষে নিজের গন্তব্যে পা বাড়াল। জনাকীর্ণ পথ গলে হাঁটতে হাঁটতে জারির ডুবন্ত বিকেলে আপন ঘাঁটিতে পৌঁছল।

হামাসের গ্রুপ কমান্ডার সাইফ আস সিরাজ জারিরের বুকভরা অবসাদ আর একরাশ বিষন্নতা দেখে কাছে ডাকল। কি জারির পাওনি খুঁজে তোমার প্রেয়সীর সন্ধান?
মাথা নত করে জারির চোখের তপ্ত পানি ছেড়ে দিল। সেই অশ্রু কমান্ডার সাইফের চোখেও বিঁধল, তাই জারিরের পিঠে বেদনার পরশ বুলাতে বুলাতে কমান্ডার ফিসফিসিয়ে বললো; তুমি ওমর ইবনুল খাত্তাব রোড হয়ে আর রোসাস স্ট্রিটে অভিযান চালাতে পারবে?

মুহুর্তেই জারিরের মুখে ফুলেরা হাসি খেলে গেল বুকের কোণে। নিভু নিভু বিভা ঝলমল করে উঠল। আনত স্বরে জারির বলল, মাননীয় কমান্ডার আপনি হুকুম দিলে আমি একচিলতেও অপেক্ষা করব না। সন্ধ্যার পরেই বেরিয়ে যাব। অনুমতি দিলে অভিযানের ফাঁকে আমার উমামার বাড়িটা এক নজর দেখে আসব। শুধু এই আশায়, উমামা পৃথিবীর বুকে আছে নাকি দূর আকাশে মিশে গেছে তারার ভিড়ে।

কমান্ডার অনুমতি আর কিছু জরুরী দিকনির্দেশনা দিল। পাঁচ সদস্যের ইউনিটের সাথে পরামর্শ হল। মাগরিবের সালাত আদায় শেষে সন্ধ্যার আলো আঁধারে মিশে জারির অতি সংগোপনে, ইযরায়েলি হায়েনাদের চোখ এড়িয়ে, হাজার ধ্বংসাবশেষ বাড়িঘর মাড়িয়ে গিয়ে পৌঁছল রণ সাজে সজ্জিত, ইযরায়েলী হায়েনাদের চারশত বাহিনীর সেনা চৌকিতে। আচানক তীব্র চোখ ধাঁধানো মুহূর্মুহু আক্রমনে ইযরায়েলিদের হকচকিয়ে দিল পাঁচ সদস্যের হামাস মুজাহিদ! যে যেদিক পারে অতর্কিত হামলা সইতে না পেরে ভো দৌড়! আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত হল ওমর ইবনুল খাত্তাব রোড। যদিও চারিদিকে পিনপতন নীরবতা। মানুষের সংক্ষিপ্ততা। তবুও আলহামদুলিল্লাহ।

অবশেষে 48মিনিটের বিভৎস পাল্টাপাল্টি যুদ্ধে দুই সাথিকে হারিয়ে, হামাস মুজাহিদ পিছু হটল। তবে যুদ্ধের বহুত সরঞ্জাম কিন্তু ঠিকই করতলগত করে। ইযরায়েলি সেনাদের পোশাক পরে জারির অন্য সদস্যদের বলল, তোমরা ফিরে যাও আমি নিজেকে সামলাতে পারব। আমার ছোট্ট আর একটা মিশন আছে, ওটা আমি একাই পূরণ করতে অনুমতি নিয়ে এসেছি। যদিও নাছোড়বান্দা অন্য দুই সদস্য কিছুতেই জারিরকে একলা ছেড়ে যেতে চাইছিল না তবুও জারিরের মার্শাল অর্ডার শুনে ফিরে যেতে হল।

জারির হাঁটতে হাঁটতে শহরের নানান ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় উমামাদের দ্বিতল ভবনের সামনে, যা ইযরায়েলি মিসাইলের আঘাত নেতিয়ে পড়েছে জমিনের বুকে। ঘরের নানান সাজ সরঞ্জাম ভেঙে চুরমার হয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে গড়িয়ে আছে। উমামার কতগুলো ক্যালিগ্রাফি ধুলো মলিন হয়ে বিবর্ণ রূপ নিয়েছে। হঠাৎ জারিরেরে চোখ একটা আধভাঙা দেয়াল আটকে গেল! ধ্বসে পড়ার কারণে দেয়ালে লিখিত বর্ণমালার রঙ চটে গেছে। বোঝা যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো লেখা! দেয়ালে বড় বড় রঙ চটা অক্ষরে হেডলাইন করাথ

جرير الايمن رسالة حائط في انتظارك

অর্থ : জারির আল আয়মান তোমার অপেক্ষায় একটি দেয়াল চিঠি!

'আজ আকাশে মেঘ ভেলার ফালি ফালি আনাগোনা। দিগন্তে আছড়ে পড়ছে সন্ধ্যা তারার রোশনীমালা। সাগরের গর্জন আজ হিম মাতাল, দোদুল্যমান বাতাসে খেজুরের কান্ড হিল্লোমান। দমকা হাওয়ার পুলকিত আঁচড়ে দেহমনে বইছে বিরহের ফল্গুধারা। সূর্য রশ্মির ঘাটতি নেই, চাঁদের স্নিগ্ধ আভায় বিন্দুকণা তফাৎ নেই, তবুও এই বিরহ কিসের উত্তর অদ্য কারো জানা

নেই। চাপা এক আতঙ্ক বিরাজ করছে চতুর্দিকে।

আল রোসাস স্ট্রিটে 19# বাড়ির বেলকনিতে বসে, আপন মনে রং তুলির গাগৌনিক সুখে মেতে উঠেছে ঊমামা বিনতে সাহিল। প্রতিটা আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলছে বিগত আট মাসে ঘটে যাওয়া ঈযরাইলি আক্রমনে ধ্বসে পড়া গাজা নগরীর নানান গগনবিদারী বিভৎস দৃশ্য। হঠাৎ উমামার কান সজাগ হয়ে উঠে ইযরায়েলী মিসাইলের কর্কশ শব্দে! উমামার মনে ভয়েরা এসে ভীড় করতে শুরু করে। এক অজ্ঞাত আশঙ্কায়। হয়তো সেটা মৃত্যুর নতুবা কিছু হারানোর ভয়। অনাগত এক আতঙ্কে অথবা বিয়োগ চিত্তবিলাপে উমামার মন মাজার কুঁকড়ে উঠে, কিন্তু সঠিক উত্তর উমামা খুঁজে পায় না।

আচানক সিঁড়ি ভেঙে কে যেন হন্তদন্ত হয়ে উপরে ধেয়ে আসছে ,অনুভব করে উমামা। বেলকনির দরজা দিয়ে ঘাড় ঘুড়িয়ে উপরে উঠে আসা লোকটাকে দেখার জন্য একনেত্রে তাই চেয়ে থাকে। অবশেষে দেখতে পায় তার বাবা মাহমুদ সাহিল।
উমামা রং তুলি রেখে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায়। সাহিল উমামাকে দীর্ঘ শ্বাস নিতে নিতে বলে;বেটি বস। উমামা বাবার চোখ লাল টকটকে আবিষ্কার করে এবং অসংখ্য প্রশ্ন আপন চেহারায় ফুটিয়ে তুলে। মেয়ের চেহারায় ভেসে ওঠা প্রশ্ন বুঝতে বেগ পেতে হয় না পিতা সাহিলের। ঠাণ্ডা সুরে সাহিল উত্তর দিতে লাগল; আমরা আমাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করব। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তুমি প্রস্তুত হও। ইযরায়েলী হায়েনারা আমাদের রোসাস স্ট্রিট অভিমুখে উল্কা বেগে ধেয়ে আসছে।
উমামা উদাস নয়নে আকাশ পানে চোখ তুলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে। মুহুর্তে হাতড়ে ফিরে শৈশব থেকে কৈশোর অতিত থেকে মহাকাল চোখ বেয়ে ঝরতে থাকে মুষলধারে অশ্রুবারি। উমামা ফের চোখ মুছে দেয়ালে লিখতে শুরু করে এক অনন্য চিঠি যার প্রাপক জারির আল আয়মান।

'আমার হাতে খুব বেশি আর সময় নেই। কিছুক্ষণ পরেই ছেড়ে যেতে হবে আমার এই জীবনের শৈশব থেকে আজ অবধি মাথা গোঁজার ঠাঁই, রোসাস এবং তৎসংলগ্ন এলাকা।আজ আপনাকে ভীষণ অনুভব করছি, যেভাবে রোজ অনুভব করতাম। তারচেয়েও ঢের বেশি। পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষরা কতটা সুখে আপন মানুষের বুকে মুখ গুজে, আর আমি কাঁদি আপনার হদিস না পেয়ে আপন শহর হারিয়ে ফেলার তড়াসে। আমার টেবিল জুড়ে কাগজের ছড়াছড়ি, তবুও আমি দেয়ালে আজ লিখছি চিঠি। জানেন কি সেই কারণ? হয়তো জানেন কিংবা না। কিন্তু আপনার সাথে বোধহয় আমার আর আখেরী মোলাকাত হবে না। দীর্ঘ 5টা মাস আমি বেলকনিতে দাঁড়িয়ে কখনো বসে কাটিয়েছি শুধু আপনার পথ চেয়ে। কিন্তু আপনি নিরুদ্দেশ। ইচ্ছেদের জমিয়ে রেখেছিলাম

বুক পিঞ্জরে আপনার ঘরে লাল টুকটুকে বধু বেশে। জিলহজের আগেই যাব ভেবে। অথচ সব লন্ডভন্ড করে দিল ইযরায়েলী হায়েনারা। ঘরের দেয়াল জুড়ে আজ হয়তো থাকার কথা ছিল আমার আপনার প্রেমের এ্যালবাম। অথচ সেই দেয়ালে আজ রচিত হচ্ছে বিদায় বা বিচ্ছেদের স্লোগান :

বেকাসুর প্রণয়ের নিরেট লেনাদেনা,
ডুবে থেকেছি সারাক্ষণ তোমার ভাবনা ।
জীবনের প্রাপ্তিতে তুমি নামি সম্বল খুঁজে ,
গড়েছিলাম অপাওয়া সুখের হাজতখানা।

আমি আজ আপন ভূবন ছেড়ে যাচ্ছি দূরে ,
নিশাচর ভবঘুরে উড়ব অজান্ত আকাশ জুড়ে
।
ভুবনের কোন প্রান্তে হবে আমার ঠিকানা ?
তা বোধহয় কেউ আর কোনদিন জানবেনা!

বিরহে আজ নির্মিত হয়েছে যে ক্ষত,
হিসেব তুমি তার বিন্দুকণাও তো কষলেনা?
আমার অণুজীবনে প্রণয় তরু বুনেছি যত,
আয়ুমনে সন্ধ্যে নামলেও, তুমি তো আর ফিরলেনা?

আমি আজ থেকে হব ঠিকানা হারা,
ইতি তোমার নিলাম্বরী উমামা।

আমি আর লিখতে পারছি না। আপনি বাকি কথা মনের পাতা থেকে বুঝে নিয়েন । আমার দুই গন্ডদেশ বেয়ে অনর্গল অশ্রুর বিপক্ষে র³ ঝরছে আপনাকে ছুঁয়ে দেখার অভিলাষ। আমার পূর্ণ হল না এই করুন বিলাপে।'

রঙ চটা চিরকুট পড়ে জারির হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ে। বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকে। মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে জারির মুর্ছা যায়। এভাবেই না জানি ফিলিস্তিনে আধা রচিত হাজারটা প্রেমের সমাধি হয়। জারির তবুও বুকে আশা বাঁধে ফের বিজয়ের পালা আসবে। উমামারা আবার নিড়ে ফিরবে এই কামনায়। পূর্ণতা পাক এমন হাজরটা আধ ভাঙ্গা প্রেমের রচনা। ধরণী থেকে মুছে যাক হায়েনাদের নৃশংসতা।

শিক্ষার্থী, হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম বড়কাটারা মাদ্রাসা ঢাকা

কুরআনের আর্তনাদ

★ **মাসরুর বিন নূর মোহাম্মদ**

আমি মাসুম। শিহাব আমার ছোটবেলার বন্ধু। একসাথেই প্রাথমিকের পাঠ চুকিয়েছি। তারপর আমি চলে আসলাম মাদরাসায় আর ও গেলো জেনারেল লাইনে। এরপর থেকে ওর সাথে কালেভদ্রে হটাৎ দেখা হয়। আজ বৃহস্পতিবার। সাপ্তাহিক ছুটি পেয়ে ওর সাক্ষাতে চলে আসলাম।

- আসরের পরে শিহাবকে টেক্সট করে জানালাম আমি তোর হোস্টেলে আসছি।

- শিহাব ফিরতি রিপ্লাই দিলো–আয়

- মাগরিবের নামাজের পরে ওর হোস্টেলে গেলাম। কুশল বিনিময় করে শিহাবকে বললাম, বন্ধু! আমাকে একটা কুরআন শরীফ দে। "সূরা ওয়াক্বিয়াহর আমলটা করে নেই।তারপর তোর সাথে জমিয়ে একটা আড্ডা দিবো। কতদিন বাদে তোর সাথে দেখা।

- "এই নে ধর"- এটা বলে আমার দিকে একটা কুরআন শরীফ এগিয়ে দিলো শিহাব।

- কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে আমার চক্ষু কপালে উঠে গেলো। আফসোসের স্বরে বললাম: এ কি অবস্থা কুরআন শরীফের গিলাফের(!)?

- কি অবস্থা মানে?

- আমি বললাম,এতো ময়লা কেন গিলাফটা? গিলাফের ওপর বালুর স্তুপ জমে গেছে। ছোটবেলায় মক্তবে কুরআন শরীফ যা শিখেছিলি,তাও কি ভুলে গেছিস? কতদিন যাবৎ কুরআন তেলাওয়াত করিস না?

- বলল:এটা আমার না। পাশের রুমমেট খালিদের কুরআন শরীফ এটা। আমি মোবাইল অ্যাপ দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করি।

- আমি বললাম,তাই বলে কুরআন শরীফের গিলাফ এতো অপরিচ্ছন্ন থাকবে? হায় আফসোস!

- শিহাব বলল,আফসোস করলি ক্যান, বিষয়টা একটু ক্লিয়ার কর তো?

- ওকে।তার আগে তোকে কিছু প্রশ্ন করি,মাইন্ড করিস না।

- "হুম" কর।জবাব দিলো শিহাব।

- আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুই তোর পোশাক সপ্তাহে কয়দিন ধৌত করিস?

- শিহাব সোজাসাপটা উত্তর- কেন,গোসলের সময় দৈনিক একবার ধৌত করি। অবশ্য সাবান দিয়ে ভালোমতো সপ্তাহে কয়েকবার তো ধোয়া হয়।

- পরিহিত কাপড় দৈনিক কয়বার ঝাড়া দিস?

- আনুমানিক 4-5বার

- (কিছু মনে করিস না)তোর দামী কাপড় কয়টা আছে?
- এই তো 7-8টা
- এবার আফসোসের বিষয়টা ক্লিয়ার করি ।শোন।
- "হুম বল" শিহাবের প্রতি উত্তর।
- আমি বলা শুরু করলাম - তুই যদি সাধারণত সপ্তাহে 3-4 বার তোর পোশাক ধৌত করতে পারিস, তাহলে কুরআন শরীফের গিলাফটা সপ্তাহে 1বার কেন ধুইতে পারিস না? তোর দামী পোশাক কয়েক সেট থাকতে পারলে, কুরআন শরীফের বেলায় কেন নরমাল কাপড়ের মাত্র "1টি" গিলাফ থাকবে?

তাছাড়া কুরআন শরীফ যদি কাল কেয়ামতের মাঠে তোর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় যে, "হে আল্লাহ! দুনিয়াতে তোমার এই বান্দা আমাকে অবহেলা করেছে। আমার যত্ন নেয় নাই।গিলাফটা ঠিকমতো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে নাই। মাসে একবারও কুরআন শরীফ পড়ে নাই। সুতরাং দুনিয়াতে আমাকে যেমন অবহেলা করেছে,আজ তুমিও তাকে অবহেলা করো। তখন সেই কঠিন বিপদে কি করার থাকবে তোর? একটু ভেবে দেখেছিস?

সুতরাং কুরআন শরীফের আর্তনাদ থেকে বাঁচতে এখনই কুরআনের প্রতি যত্ন নে। দৈনিক নিয়ম করে অল্প হলেও কুরআন শরীফ পড়। বুকে নিয়ে চুমু খা। গিলাফটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখ। বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোর অন্তরটা পরিস্কার করে দিবেন। তোকে ভালোবাসবেন। আর আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন,তার উভয় জগতই সফল।

- শিহাব মাথা নাড়িয়ে আমার কথায় সাঁয় দিয়ে বলল, দোস্ত বিষয়টা তো তোর মতো এতোটা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখিনি...!
- কথার সূত্র ধরে আরো বললাম,তাছাড়া ছোট ছোট আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা বিরাট প্রতিদান দিয়ে থাকেন। শুধু আমরা সেই আমলগুলো করি না কিংবা গুরুত্ব কম দিয়ে থাকি। তাই এসব ছোট ছোট আমলের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।
- শিহাব বলল,ঠিক আছে দোস্ত। আমি তোকে কথা দিচ্ছি, গিলাফটা সুন্দর করে ধৌত করবো আর উন্নত ও ভালো কাপড়ের গিলাফ বানাবো (ইনশাআল্লাহ)।

আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করুন (আমিন)।
এরপর আমরা দু'জনেই কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি মনোযোগী হলাম।

শিক্ষক, জামিআ আরাবিয়া মদীনাতুল উলূম মাদরাসা, পঞ্চবটি,নারায়ণগঞ্জ।

হেরার আলো

রফিকুল ইসলাম রিয়াদ

চৌদ্দশত বছর আগের কথা। তপ্ত মরুর বুকে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল জনপদ। নিকষ আঁধারের ছিল আস্তরণ। অন্ধকারে আবরণ ছিল মরুচারীর সমস্ত নগড়। হানাহানি ও গৌত্রীয় বিগ্ধহে প্রায়ই রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠত আরবের ভূমি। মরুভূমির নগড় রাজধানী খাঁ হয়ে রয়েছিল এক পেয়ালা প্রশান্তির জলে তৃষ্ঞা মিটানোর প্রতিক্ষায়। সেই সময় ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষকে আশার আলোর দিক দেওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়, আলোর ফেরিওয়ালা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আরবের ভূমিকে এক পেয়ালা সুধাজল পান করিয়ে পিপাসা নিবারণের জন্য।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পর সকল পাপাচারের আস্তরণে পবিত্র সমীরণ এসে উড়িয়ে দেয় পাপ ডাকা চাদর। যেন আঁধার ভুবনে উদিত হলো এক জ্বলমলে শুভ্র চাঁদ। তৃষিত নগড়ে নামলো রহমের অঝোর ফোয়ারা। কুফর আর শিরকের আস্তানায় জ্বেলে উঠলো দ্বীন ঈমানের পূন্য প্রদিপ।

ধীরে ধীরে নবীজি বড় হতে লাগলেন । কৈশর পেড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যৌবনের বয়স যাপন করছিলেন, তখন তিনি হেরা নামক গুহায় নির্জনতায় অপেক্ষা করেছিলেন এক সোনালী রবির। এক সোনালী প্রভাতের। তিনি সেই গুহায় দিনের অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদত ও যিকিরে ধ্যান মগ্ন থাকতেন। অনেক সময় দুই তিন দিনের জন্য অন্ন বস্ত্র নিয়ে চলে যেতেন চির চেনা হেরা গুহায়।

কোনো একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাগ্র চিত্তে মুরাক্বাবায় বিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ এক আগন্তুক লোকের আগমন

হয়। নবীজী (সা:) এমন লোককে স্বচোক্ষে কোনোদিন দেখেননি। নবীজী সা: অনেকটা বিচলিত হলেন। নবীর কেবল তাঁর দিকে নির্বাক পলক ।
নবীজির শব্দহীন দৃষ্টি। নিরবতা বিরাজ করেছে উভয়ের মধ্যে। তাঁর থেকে অধিক নিথর হয়ে দণ্ডায়মান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সহসা নিরবতা ছিঁড়ে আগন্তুক নবীজীকে বলল “ইক্বরা” অর্থ পড়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয়ে থরথর করে কাঁপছেন। পুরো শরীর হলো ঘামের নিবাস। তদুত্তরে তিনি বলেন আমিতো পড়তে অক্ষম। আগন্তুক এভাবে তিনবার বলার পর উত্তর না পাওয়াতে সে নবীজীকে বুকে চেপে ধরল এবং পড়িয়ে দিল “পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন”(পাড়া 30,সুরা আলাক, আয়াত 1)। নবীজী তখন দৃঢ় গলায় তাঁর সাথে সাথে পড়লেন । এবং অন্তরে ধারণ করলেন। সেই আগন্তুক ছিল ওহি বাহক হযরত জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সেই দিন নবীজী (সা:) এর শিরা উপশিরা ভয়ে স্থবির হয়ে জ্বর উঠে গিয়েছিল। তিনি হাঁপিয়ে দ্রুত বাড়িতে গেলেন। নবীজির বদনে ভয়ের চিহ্ন। খিঁচুনি উঠেছে ভীষণ। কাঁপা স্বরে খাদিজা (রা:)কে বললেন আমার প্রচন্ড ভয় হচ্ছে । আমার প্রতিটি শিরা উপশিরা যেন ঠাণ্ডা হয়ে স্থির হয়ে গেছে। আমাকে তাড়াতাড়ি বস্ত্রাবৃত করো। খাদিজা (রা:) থমকে উঠলেন এবং বললেন তোমার আজ এমন কি হয়েছে? যার জন্য তুমি এতো ভয় পাচ্ছ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা (রা:) এর কাছে সমস্ত ঘটনা ব্য³ করেন । খাদিজা (রা:) মনোযোগী যেন একটা কথাও ছুটে না যায়। শুনছেন আর বিচক্ষণতার সাথে বুঝছেন। তিনি বুঝা বা কোনো কিছু বুঝানোর ক্ষেত্রে দূরদর্শী ছিলেন। অতঃপর তিনি নবীজিকে অভয় দিয়ে বললেন, তুমি ভয় পেয়ো না। অশুভ কিছু হতে যাচ্ছে না। এটা তোমার খুশি ও বিষম আনন্দের সংবাদ। আপনি তামাম পৃথিবীর মহান ব্যক্তি হতে যাচ্ছেন।

একথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্ত হলেন অনেকটা। মনের সকল ভীতি দূরীভূত হয়। আবারও সেই চির চেনা হেরা গুহায় আল্লাহর ধ্যানে চলে যান। সেই ঐশী আলোর আশায়। প্রভাতের সোনার রবির আশায়। যে রবি ঢেকে দেবে পৃথিবীর ঘোর অন্ধকার। সেই হেরা গুহায় উদয় হয় কাঙ্খিত সোনালী রবি। প্রজ্বলিত হয় পৃথিবীর অন্ধকারের আচ্ছন্নতা দূর করার জন্য পুণ্য আলো। নাযিল হয় সেই অনির্বায সত্যের পয়গাম পবিত্র আল-কোরআন। সেই হেরা গুহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুকের কোনায় জায়গা দেওয়ার নিমিত্তে তার সাথে নবীজীর গভীর প্রেম সৃষ্টি হয়। এবং সেখানেই ঐশী বাণীর উন্মেষ ঘটে ও আঁধারের আচ্ছন্ন দূর হওয়ার জন্য ঐশী আলো প্রজ্জলিত হয়। এজন্যই সেই আলোর আরেক নাম হেরার আলো।

শিক্ষার্থী, বাহাদুরপুর মাদ্রাসা সুনামগঞ্জ সদর।

ঈদ আনন্দে শোক

● **মাফাজ্জল হোসেন (শান্ত)**

সকাল 7টা বেজে 30 মিনিট। ফোনে রিং হচ্ছে। রিসিভ করা মাত্রই ওপাশ থেকে ভেসে আসলো, কিরে ছোটন কেমন আছিস? ছোটন বললো, আরে ভাইয়া তুমি!... হ্যাঁ,মা'কে বলিস, আমি আসছি।

রবি, মা-বাবার বড় ছেলে। আর সিফাত হচ্ছে রবি'র একমাত্র ছোট ভাই। রবি আদর করে তাকে ছোটন বলে ডাকে। শুধু রবি নয়, পরিবারের সবাই তাকে ছোটন বলেই ডাকে। আর মাত্র তিনদিন পর ঈদ। রবি চাকরি পাওয়ার পর এটাই তার প্রথম ঈদ। সে খুব খুশি। কারণ, সে তার চাকরির বেতন থেকে মা-বাবাসহ ছোটনের জন্য ঈদের শপিং করেছে। আজ রবি সকাল সকাল রাস্তায় বেরিয়েছে বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে। বাস কাউন্টারে এসে টিকিট নিয়ে সে বাসে উঠে। অল্প কিছুক্ষণ পরই বাস তার গন্তব্যে যাত্রা করে।

রবি জানালার ধারে বসে মৃদু হাওয়ায় ভাবছে তাঁর অতীতের স্মৃতি। তার মা-বাবা তাকে কত কষ্ট করে লেখা-পড়া করিয়েছে। তার মনে পড়ে ছোটবেলার সেই ঈদের কথা। যে ঈদের আগে তার খুব মন খারাপ ছিলো। কারণ বাবা তাকে নতুন জামা কিনে দেয়নি। কিনে দেয়নি বললে ভুল হবে, আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় কিনে দিতে পারেনি। রবি'র মন খারাপ দেখে, ঈদের আগের দিন বিকেলবেলা মা তাঁর শখের দু'টো মুরগি বাবার হাতে তুলে দেয় বিক্রি করতে। বাবা সেই মুরগি বিক্রি করে, সেদিন-ই রবিকে নতুন জামা কিনে দেয়। তখন রবি'র খুশির যেন শেষ ছিলো না। এই ভাবতে ভাবতে রবি ঘুমিয়ে যায়। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখছে, আজ তার বাড়ি যাওয়ার কথা শুনে মা বার বার পথে এসে উঁকি দিচ্ছে, ছেলেকে দেখা যায় কিনা! আর ছোটন বাবাকে বারংবার জিজ্ঞেস করছে, “বাবা! ভাইয়া কখন আসবে?” উত্তরে বাবা বলছে, এই বুঝি চলে আসলো, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর রবি যখন বাড়িতে যায়, তখন সবাই খুব খুশি। রবি ছোটনকে নতুন জামা দিলে, জামাটি দেখে ছোটন বলছে, ভাইয়া আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। বাবা বলছে আমাদের জন্য এত টাকা খরচ না করলেও পারতে। আর মায়ের চোখ বেয়ে ঝড়ে পড়ছে অশ্রু। রবি দেখে বলছে মা তু..!

হঠাৎ বিকট শব্দে রবি'র ভেঙে গেলো স্বপ্নময় ঘুম। আর চোখ দু'টো মিলতে না

মিলতেই ভর করলো আঁধার। রক্তাক্ত দেহে না ফেরার দেশের যাত্রী হয়ে ওপারে পারি জমালো রবি। ওদিকে মায়ের অন্তরে ছটফটানি শুরু হয়েছে। মা ছোটনকে বললো, তোর বড় ভাইকে ফোন দিয়ে শোনতো কত দূর আছে এখন? ছোটন মায়ের কথা মতো ফোন দিলে, কল যাচ্ছে কিন্তু ফোন ধরছে না। তাই সে তার মাকে বললো, "মা রিং হচ্ছে কিন্তু ফোন রিসিভ করছে না। হয়তো ভাইয়া গাড়ির শব্দে বুঝতে পারছে না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তবুও রবি'র কোনো খবর নেই। তার মা-বাবা খুবই চিন্তা করছেন। আর ভাবছেন ছেলেটা সেই যে সকালে রওনাা হলো, সারাদিন কোনো খোঁজ-খবর নেই। ফোন দিলে ফোনও ধরছে না। ছেলেটার কিছু হলো না তো। মা খুব চিন্তান্বিত।

হঠাৎ ছোটন চিৎকার করে তার মা-বাবাকে ডাকছে। ছোটনের চিৎকার শুনে তার মা-বাবা দু'জনেই আসলো। মা বললেন তোর আবার কি হলো? ছোটন অশ্রু ভেজা চোখে বললো, মা দেখো টিভি'তে দেখাচ্ছে বাস এক্সিডেন্ট হয়েছে। আর রক্তাক্ত ঐ লাশটিকে আমার রবি ভাইয়ার মতো দেখাচ্ছে। মা-বাবা দেখা মাত্রই চিনতে পারেন তার আদরের ছেলেকে। মা রবি'র মৃত চেহারা দেখা মাত্রই জ্ঞান হারিয়ে ধপ করে মাটিতে পরে গেলেন। অশ্রু চোখে হতবিহ্বল তার বাবা। আর ছোটনের কানে এখনো বাজছে, "কিরে ছোটন কেমন আছিস? মা'কে বলিস, আমি আসছি।"

উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

মধুর সমাধান

ফয়সাল হাসান শুভ্র

আবদুল্লাহ সবেমাত্র আসরের নামাজ শেষ করে মসজিদ থেকে বের হয়েছে। ইমাম সাহেব নামাজ শেষে মসজিদে কোরআন তেলাওয়াত করছেন। ইমাম সাহেবের সুরেলা কণ্ঠের তেলাওয়াত এখনো তার কানে বাজছে। কি অপূর্ব, কি সুমধুর মনকাড়া সূর "যা- লিকাল কিতাবু লা-রাইবা ফীহি হুদাললিল মুত্তাকীন"(সূরা-বাকারাঃ ২) অর্থ - এই সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত। আল্লাহর বানী কোরআন যা মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত, তাদের পথপ্রদর্শক যার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে দুনিয়ার সবকিছু আছে সব সমাধান।

আবদুল্লাহ গুনগুন করতে করতে সামনের দিকে এগোয়।চারদিক বেশ শান্তশিষ্ট পরিবেশ, রোদ অবশ্য হালকা আছে, তবে দুপুরের মতো তেজ নেই। চারদিকে পাখির কলকাকলি আর দখিনা স্নিগ্ধ বাতাস সবমিলিয়ে ভালোই লাগছিলো আবদুল্লাহর। কাঁঠাল গাছটায় দুটি বুলবুলি পাখি বাসা বেঁধেছে । খুব যত্ন করে খড়কুটো এনে বাসা বেঁধেছে, অতী শীঘ্রই ডিম পাড়বে হয়তো। এমন সময় পাশের গ্রাম থেকে তীব্র গান-বাজনা আর ঢোলের আওয়াজ কানে এলো।আবদুল্লাহদের পাশের গ্রাম হিন্দু পাড়া এখন তাদের পূজার সময় এই কারনেই বিকট শব্দে গান-বাজনা হচ্ছে। অবশ্য এনিয়ে আবদুল্লাহর মাথাব্যথা নেই। ওদের ধর্ম ওরা পালন করুক।

ও আরেকটু সামনে এগোতেই দূর থেকে একটা ছোটোখাটো জটলা চোখে পড়লো। একজন বেশ উত্তেজিত ভাবে হাত-পা নেড়ে বক্তব্য দিচ্ছে আর তা শুনে শ্রোতারাও উত্তেজিত হয়ে পড়তেছে। আরেকটু কাছে এগোতেই বক্তার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে গেলো আব্দুল্লাহর। তার সহপাঠী

ফরহাদ। ফরহাদ ছেলেটা এমনিতেই একটু বেশী আবেগপ্রবণ। হালকা বিষয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আবদুল্লাহ উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে গেলো সেইদিকে। সেখানে গিয়ে যা বুঝলো তার মর্ম এই যে, কুমিল্লায় এক পূজামন্ডপে হিন্দুদের মূর্তির পায়ের কাছে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন রাখা হয়েছে। কথাটা শুনে আঁৎকে উঠলো আবদুল্লাহর মন। যে কোরআনকে মুসলিমরা তাদের প্রাণের বিনিময়েও এক ফোঁটা ধুলি লাগাতে রাজী নয়,আর সেই কোরআনেরই এতো বড় অবমাননা!

ইতোমধ্যে উপস্থিত জনতার মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে, তারা এর বদলা নিবেই নিবে। আজ তারা এর শেষ দেখেই ছাড়বে। তাঁরা ঠিক করেছে ওদের পূজা দিতে দিবে না। ওদের মেরেই ফেলবে। একটা হিন্দুও জীবিত রাখবে না।তখন আবদুল্লাহ সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললো, প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা সবাই শান্ত হোন। বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করুন। তখন ফরহাদ বললো, কিসের বোঝাবুঝি! আমার কোরআনের এতো বড় অবমাননা আমরা সহ্য করবো না। সবাই ফরহাদের কথায় সায় দিয়ে বললোথ হ্যাঁ হ্যাঁ আমারা সইবো না। আজ ওদের একদিন কি আমাদের একদিন।

তখন আবদুল্লাহ বললো, প্রিয় ভাইয়েরা আমরা কোরআনের অবমাননার প্রতিবাদ করতে গিয়ে উল্টো গোনাহ করে ফেলছি নাতো ? তখন অনেকে উত্তেজিত হয়ে বললো কি বলতে চাও তুমি? অনেকে তো পাগলই বলে বসলো। তাঁরা বলে, আল-কোরআনের অবমাননা করেছে হিন্দুরা , আর তুমি তাদের পক্ষ নিচ্ছো? ছি!ছি! আবদুল্লাহ তোমাকে আমরা অনেক ধার্মিক আর ভালো ভাবতাম। এই হলো তার নমূনা?

তখন আবদুল্লাহ বললো, প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা! আগে আমার কথাটি শুনুন, তারপর না হয় মন্তব্য করুন। তখন সেখানে সবার মুরুব্বি, আবদুর রহমান চাচা বললেনথ আচ্ছা বলো তুমি কি বলতে চাও। তখন আবদুল্লাহ বললো, ভাইয়েরা আল্লাহ তায়ালা সূরা আন-আম এর ১০৮ নাম্বার নাম্বার আয়াতে বলেন -"আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিওনা। তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানবশত আল্লাহকে গালি দেবে"(সূরা আন-আম : ১০৮)

তখন উপস্থিত জনতার মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো, তাহলে কি তাদের এমনি এমনি ছেড়ে দিবো? এমন কাণ্ড যদি রাসূল (সা) এর সময়ে সংঘটিত হতো তাহলে কি রাসূল (সা) তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতেন না? তখন আবদুল্লাহ মুচকি হেসে বললো, প্রিয় ভাই তাহলে শুনুন, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্নিত একদিন এক বেদুইন দাঁড়িয়ে মসজিদে প্রস্রাব করা শুরু করল। উপস্থিত লোকজন তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু

প্রিয় নবী (সা.) তাদের বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। ওর প্রস্রাব শেষ হলে এক বালতি পানি ঢেলে দিয়ো। প্রিয় ভাইয়েরা এটা রাসূলের সামনে জঘন্য অপরাধ ছিলো না? রাসূল কি তার গর্দান ফেলে দিয়েছেন? না! তা করেননি বরং তিনি বলেছেন-

"নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, তোমাদের সহজ ও বিনয়ী আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা বা উগ্রতার জন্য নয়। (বোখারি শরিফ: ২২০)"

প্রিয় ভাইয়েরা, মদিনা সনদের দুটো ধারা ছিল:

১. অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

২. কেউ অপরাধ করলে তার দোষ তার সম্প্রদায় কিংবা বংশকে দেয়া যাবে না বরং এটা একান্তই তার অপরাধ। তাহলে আপনি কেনো ওদের প্রতিমা ভাঙ্গতে যাবেন?কেনো ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে যাবেন? অপরাধ করেছে কুমিল্লার হিন্দুরা অন্যরা তো দোষ করেনি, তাহলে আমরা কেনো অন্য হিন্দুদের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালাবো? এই কথা শোনার পর সবাই যেনো কেমন নিশ্চুপ হয়ে গেছে, আগের উত্তেজিত ভাবটা আর নেই বরং উৎসুক হয়ে আবদুল্লাহর কথা শুনছে।

তখন আবদুল্লাহ বললো, প্রিয় ভাইয়েরা রাসূল (সা) বলেন - "সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকায় সংখ্যালঘু অমুসলিমরা আমানতের মতো, যারা তাদের কষ্ট দেবে কেয়ামতের দিন আমি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে নালিশ করবো" (আবু দাঊদঃ৩০৫২)
তাহলে ভাবুন আমরা কত বড় গোনাহের কাজে লিপ্ত হতে যাচ্ছিলাম? এইবার উপস্থিত জনতা তার কথায় একবাক্যে সায় দিলো। তখন ফরহাদ বললো এখন উপায় কি?

তারপর আবদুল্লাহ বললো, প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম অন্য ধর্মকে সম্মান করতে শেখায়,ইসলাম আমাদের বিনয়ী হতে শেখায়। চলুন আমরা বিনয়ের সাথে এর সমাধান করি। আমরা প্রশাসনকে এ বিষয়ে অবগত করি, ওনারাই এর রহস্য উদঘাটন করুক। পারলে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের জায়গা হতে প্রশাসনকে সহায়তা করি। অপরাধীর নিশ্চয়ই সাজা হওয়া উচিত, আর বাকিটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেই। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি কোরআন নাজিল করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষণ করবো" (সুরা হিজর - ০৯)

রায়পুর, লক্ষ্মীপুর

অর্থ পুরুষের চাবিকাঠি

→ **মুহিউদ্দীন ইবনে মোস্তাফিজ**

জীবনের পথে বের হয়ে জীবনকে বুঝতে শিখেছি। পুরুষের কোন অসুখ বিসুখ থাকতে নেই। পুরুষেরও অসুখ বিসুখ হয় তা এখন বুঝা যায় না। পুরুষের অসুখ বিসুখ সব ছোটবেলায় শেষ হয়ে যায়। যখন থেকে নিজেকে বাবার স্থানে রাখতে শুরু করেছি সেদিন সব স্পষ্ট হয়ে গেছে। বাবার পথে হাঁটতে বের হয়ে জেনেছি, পুরুষের মূলত টাকাই শক্তির মূল। যেদিন বাড়ির চৌকাঠ মাড়িয়ে শহরমুখী হয়ে জেনেছি, পুরুষ মানুষের মূলত সব ধরনের পরিস্থিতে শক্ত থাকতে হয়। অসুখ বিসুখকে পিছনে ফেলতে হয়। অসুখ বিসুখবে প্রাধান্য দিতে নেই।

পরিস্থিতি আমাকে শিখিয়েছে পকেটখালি মানে তোমার কোন মূল্য নেই। যার পকেট যত বেশি ভরা থাকে, সে ততই মূল্যবান। এক কথায় বলা চলে, পকেট পুরুষের মেরুদণ্ড সোজা রাখে। পকেটখালি মেরুদণ্ড বাঁকা। যদি পুরুষের পকেট সুস্থ থাকে, তাহলে পুরুষ সুস্থ, আর যদি পকেট অসুস্থ হয়, তাহলে পুরুষও অসুস্থ। পুরুষের আবেগ চোখের কোণে জল টলমল করে তবুও তার কোন মূল্য নেই। পুরুষেকে না কাঁদার শাস্ত্র পড়ানো হয় চোখফুটার সাথে সাথে।

পুরুষের সখ, আহ্লাদ, স্বপ্ন, ইচ্ছে থাকলেও তার কোন মূল্য নেই যদি পকেট কথা না বলে। পকেট ভরপুর তখন স্বপ্ন, সখ, আহ্লাদ সব কথা বলে। পকেটখালি থাকলে বিশ্বস্ত চোখ গুলোও দৃষ্টি বদলিয়ে ফেলে। এই পৃথিবীর বহু রূপ দেখেছি।

পকেটখালি থাকলে হাসির পাত্র হতে হয় বন্ধুমহলে। পকেটের মূল্য এ সমাজে অনেক। মানুষের চাইতে পকেটের খবর বেশি নেয় মানুষ। অযোগ্যের পাত্র হতে হয় বউয়ের কাছে। সন্তানের কাছে গুরুত্বহীন পিতা হয়ে থাকতে হয়। অবহেলার অবজ্ঞার পাত্র হতে হয় আত্মীয়দের নিকট।

পুরুষকে বিচার করা হয় পকেটের ওজন অনুসারে। সব বিচার পকেটের দিকে তাকিয়ে করা হয়। চাকরির মতো সোনার হরিণও পকেটের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পকেটেখালি থাকলে সালিশ-বিচার বিপক্ষে চলে যায়; আর যদি পকেট ভারি থাকে তাহলে সত্যও মিথ্যা হয়ে যায়। পকেটখালি থাকলে প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছেও অসহ্য স্বামী। পুরুষ মানুষের পকেটখালি থাকলে তামাম দুনিয়ার সব তার বিপরীতে হাঁটে।

পুরুষ মানুষের সংসার হচ্ছে তার পকেট। পকেট ভারী তো বউয়ের প্রাণের স্বামী, সন্তানের আর্দশপিতা। আত্মীয়দের নিকট গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। সমাজে সম্মানীয় ব্যক্তি। যে পুরুষের পকেট যতটা ভরা, সে পুরুষের সংসার ততো সুখী। পকেটখালি নিয়ে ভালো বন্ধু হওয়া যায় না। পকেটখালি নিয়ে প্রিয়মানুষ হওয়া যায় না। খালি পকেট নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায় না। খালি পকেট নিয়ে সমাজের মানুষের কাছে পরিচয় দেয়া জঘন্য ব্যাপার। যে পুরুষের খালি পকেট সে যেনো মানুষি নয়। এমন একটা পরিস্থিতি এই সমাজে।

খালি পকেট মানে তুমি মৃত জিনিসের মত অপ্রয়োজনীয়। খালি পকেট মানে তুমি সস্তা তোমার কোন মূল্য নেই। খালি পকেট মানে তুমি অযোগ্য। খালি পকেট মানে তুমি তুচ্ছ এক পুতুল। খালি পকেট হলে চেনা মানুষও রাস্তায় তোমাকে পরিচয় দিবে না। খালি পকেট হলে তোমার পরিচিত মুখ, অপরিচিত হয়ে যায়। এটাই শিখিয়েছে আমাদের এই সমাজ। খালি পকেট মানে তোমার বিপদের দিনে তোমার পাশে কেউ নেই। খালি পকেট মানে তুমি ছোটলোক। পকেটই হলো বর্তমানের জীবন। পকেট ভরা মানে তুমি জনপ্রিয়। পকেট ভরা মানে তুমি ক্ষমতাশীল। পকেট ভরা মানে তুমি নেতা। মানুষের সকল পরিচয় পকেট দিয়ে হয়। মানুষ স্মার্ট কিনা তাও বহণ করে পকেট। খালি পকেট মানে তুমি পৃথিবীর নিকৃষ্ট মানুষ। এটাই জীবন মেনে নিতে হবে। সমাজ যদি ঠিক না হয়।

লেখক ও নবীন আলেম।
কাপ্তাই রাস্তার মাথা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

ছুটি

বেলা এগারোটার মধ্যে ছাত্ররা বাড়ি চলে গেল। মাদরাসার মাঠে এক কোণে বসে চারিপাশের নীরবতাকে পরখ করছিলাম। করোটিতে ভীষণ শূন্যতা অনুভব করলাম।মূহুর্তেই ফিরে গেলাম পিছনের দিনগুলোতে। মাদরাসার মাসিকবন্ধে কেমন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হতো আমার ভিতর-বাহির।একমাস পর বাড়িতে যাবার আনন্দে বিমোহিত হতাম। শহর পেড়িয়ে যখন গ্রামের নির্মল সজীবতাকে খুঁজে পেতাম দু'টি চোখ জুড়িয়ে যেত। গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির পাশে ঠাঁয় দাড়ানো নারিকেল গাছের পল্লবিত সবুজ মাথা দেখলেই হৃদয়ে প্রশান্তির পরশ ছোঁয়ে যেত। নীলাভ আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘকুঞ্জ মাথায় নিয়ে সবুজ ঘাসের গালিচায় হেঁটে হেঁটে যেতাম। মা'র হাসিমাখা মুখটি দেখতে পেলে কতই না খুশি লাগতো। বন্ধের দিনগুলো ছিলো স্বপ্নের মতো সুন্দর। মায়ের হাতে মজাদার খাবার আর গ্রাম জুড়ে ঘুরে বেড়ানো। শীতে মায়ের হাতে পিঠাপুলি,গ্রীষ্মে আম-কাঠালের উৎসব,বর্ষায় নদীতে ঝাঁপাঝাপি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অনুভব-অনুভূতি,আনন্দ -উচ্ছ্বাস সবগুলো কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেল। আনন্দের সেই রাঘ হৃদয় বীণায় আর বেজে ওঠে না। কোলাহলবিহীন মাদরাসায় একা একা পায়চারি করছি - হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে গায়ে লাগলো। ধীরে ধীরে আকাশ মেঘলা হলো। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামবে..

মো.আশিকুর রহমান খান
জামিয়া কাশেফুল উলুম হাটখোলা মাদ্রাসা, মধুপুর-টাংগাইল।

গ্রামের পথে

প্রশান্তির অন্যতম জায়গা নিজ গ্রামের বাড়ি। সেদিন ছিল রবিবার। বাড়ি যাওয়ার দিনক্ষণ। দিনটি আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। নগরের কোলাহল,বিষাক্ত নগর ও দূষিত পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তির জন্য হাহাকার। তখনই গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সময়টি ঘনিয়ে এসেছিল। ভোরের আলোয় চোখ মেলতেই মনেতে খুশি অনুভব হয়। খুশি খুশি মনে পরিপাটি হয়ে নিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাগপত্র একসঙ্গে যুক্ত করছিলাম। আমার মত সবাই তৈরি হতে ব্যস্ত।

মনখানিতে আনন্দের বন্যা বইছে। অনেকমাস পর প্রকৃতির কোলে ফেরা। প্রকৃতির নীড়ে যে শান্তিটুকু সেইটুকু সুখ আর কোনো স্থানে নেই। ঘড়ির কাঁটায় ১০ টার ঘন্টা বেজে উঠল।বাড়ি উদ্দেশ্য রওনা দিলাম।

গাড়ি থেকে অপলক দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে মুখ করে চেয়ে রইলাম। আর দেখতে পেয়েছিলাম- সবুজ-শ্যামল গাছপালা সারিবদ্ধভাবে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চক্ষুতে আরো অবলোকন হয়েছিল:ফসল ভরা জমি,কৃষকরা ফসল রোপণ করছিল, ফসল কাটছিল,ছোট্ট শিশুরা খেলা করছিল,নারীরা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত ও বাড়ির পাশে শাকসবজির বাগান নিয়ে তাদের ব্যস্ততা। বাতাস বইছে আর বইছে। প্রকৃতি আমাকে তার সাথে মিশিয়ে নিলো। প্রকৃতি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলো।

অবশেষে, প্রশান্তির স্থানে অবস্থান। মনখানি আবেগে আপ্লুত। যাওয়ার পথে কোনো জ্যাম ছিলো না, সেহেতু স্বস্তিদায়ক ভাবে বাড়ি ফিরেছিলাম। কিছুটা ক্লান্তিবোধ লাগছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, ঘর পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম।

হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাস। বাতাস আরোও বেশি তীব্র হলো। চেহারা জমে গেলো ধুলোবালিতে। কালো মেঘ,বিদ্যুৎ চমক এবং বিশাল বিশাল বজ্রপাত। নেমে এলো মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির পানিতে থৈ থৈ চারপাশ। ইচ্ছেমতো বৃষ্টির পানিতে ভিজে নিলাম। বৃষ্টির পানি টিনে পড়ার সুন্দর শব্দ কানে আসতে শুরু করেছিল। উফফফ!কি দারুণ মুহূর্ত। বৃষ্টির পানি টিনের চালে আছড়ে পড়ছিল আর আমি আছড়ে পড়া পানি নিয়ে খেলছিলাম। বৃষ্টির মিষ্টিমধুর সুর, আকাশে কালো মেঘ আর কিছুক্ষণ পরপর বিদ্যুৎতের চমকের জ্বলক, আমার বাড়ি গমনকে আরোও বেশি রাঙিয়ে দিয়েছিল। এরকম বৃষ্টির দিন উপভোগ করার সৌভাগ্য হবে তা কল্পনার বাইরে। এদিকে বৃষ্টি থামাথামির কোনো নামগন্ধ নেই।

গ্রামের পথ সর্বদা সুন্দর। আর মানুষ জীবন জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে যাত্রা করছে। নিরিবিলি পরিবেশ এবং শিঁকড়ের টানে গ্রামে আসতে বাধ্য। এভাবে, আমার জীবনে চমৎকার একটি দিনের মুহূর্ত হয়েছিল।সেরা একটি দিন হয়েছিল যা-মনের ক্যানভাসে স্মৃতি হয়ে রইল। সবুজ-শ্যামল প্রকৃতির নীড়ে আমার শেষ নিঃশ্বাসটুকুর -প্রত্যাশা।

সৈয়দা ফারিহা আকতার
শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম কলেজ,চট্টগ্রাম।
০৭.০৪.২০২৪। রবিবার

আজ আমি কোথাও যাব না

হুমায়ুন আহমেদ এর একটা বই আছে "আজ আমি কোথাও যাব না" নামে। আর সদাত হোসাইন এর বই আছে "আজ আমার কোথাও যাওয়ার নেই"। আমার অবস্থাও আজকে ঠিক বই দুটির মত। বিজ্ঞাপনের "পোস্টার বয় "-এর ন্যায় বইয়ের "কাভার ম্যান" যেন আজ আমি।

বৃহস্পতিবার। তাফসীর, হাদীস, আইন,আকিদা আর ইতিহাস নিয়ে কাটানো একটি সপ্তাহের শেষে বিরতির দিন আমাদের। লেখার মাঝে 'কমা চিহ্ন' যেমন। আগের মাদ্রাসায় এই দিন বিকালে বাইরে যাওয়া, বটতলা কিংবা পাঁচর স্ট্যান্ডে গিয়ে ঝালমুড়ি-ফুসকা খাওয়া হত। যা ছিল আমাদের "আকায়েদ কিতাবে"র সবক মুখস্থ করার মত অবশ্য-করণীয়। কিন্তু এই মাদ্রাসার দুটির নিয়ম ভিন্ন। ছুটি পাওয়া যায় মঙ্গলবার বিকাল আর শুক্রবার সারাদিন। তাই আজ একমাস পর যখন বৃহস্পতিবারে বাইরে যাওয়ার সুযোগ এল,কেউ-ই আর রুমে বসে বিকাল কাটাতে রাজি নয়। কিন্তু আমার কেন যেন, কোথাও যেতে মন চাচ্ছে না। অকারণ, কোথাও যাওয়া বারণ- এর মত বেখাপ্পা অবস্থা।কিংবা 'আমার একলা লাগে ভারী'।

সবাই চলে যাওয়ার পর আমি জানালার পাশে গিয়ে বসলাম। তখনই ধীর পায়ে পাশে এসে বসল 'একাকিত্ব'। জানালার শিক গলে যতদূর চোখ যায় শুধু বিল্ডিং, আর বিল্ডিং। খাঁ খাঁ রোদ ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর ছাদ জুড়ে। আমরা যেহেতু পাঁচ তলায় বসে আছি তাই নিচের ব্যস্ত সড়ক, রোদ মাথায় হেটে যাওয়া মানুষ, গাড়ি-ঘোড়ার ভীড় কিছুই নজরে আসছে না। সুন্দরবনের টাওয়ারের চূড়ায় দাড়িয়ে যেমন গাছপালার মাথা ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। তবে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। কোথায় প্রাণের স্পন্দন 'ম্যানগ্রভ বন' আর কোথায় রোদে পোড়া এই ইট-পাথরের দঙ্গল! সুন্দরবনের তুলনায় ইট-পাথরের দালান যেন চৈত্রের রোদে চৌচির হওয়া ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা পাতাবিহীন গাছের কঙ্কাল। আর সারি সারি কঙ্কালের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা কোন আকর্ষণীয় দৃশ্য নয় নিশ্চয়ই। তাই জানালার পাশ ছেড়ে সিটে এসে গা এলিয়ে দিলাম।

পাশে জালালাইনের দরস হচ্ছে। 'মানতেকে'র তাত্ত্বিক প্যাঁচে মনযোগ দেয়া কষ্টসাধ্য , বিধায় লেখক হাসান ইনামের "ঢাকায় ফাগুন" বইটা হাতে নিলাম। ধূর, এটাতেও মন বসাতে পারছি না। লেখক শুরু থেকেই টাইম ট্রাভেলের জটিল ধাঁধাঁয় ফেলে রেখেছেন। "একাকিত্ব" - বন্ধু আমার, উদাস দুপুরের গল্প শুনাও আমায়।

খালিদ নিশাচর
১৬-০৫-২৪২০
বৃহস্পতিবার।

যমুনার তীরে একদিন

● **সামীউল হক নাজিব**

তারিখটা বেমালুম ভুলে গেছি। খুব সম্ভবত সোমবার দিন। বেহদ দুঃখবোধ অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে চারদিক থেকে। মন ও মস্তিষ্ককে আহ্লাদিত করার মানসে-কোথাও ঘুরতে বেরুনোর অভিপ্রায় তাড়া করছে প্রতিনিয়ত। এদিকে আবার ছুটি শেষ হয়ে মাদ্রাসায় ফেরার সময় ঘনিয়ে আসছে। কি যে করি! কিছুই বুঝতে পারছি না। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে নিয়ত করলাম, রাতে মু'আযের সাথে আলাপ করবো যে, কোথায় ঘুরতে বেরুনো যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হালকা নিশ্চিন্ত হলাম।

রাতে মু'আযের সাথে আলাপ হলো। দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যমুনা সেতু যাবো। সবকিছু ঠিকঠাক। ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন মঙ্গলবার সুবহে সাদিকের আযান শুনে ঘুম থেকে জাগলাম। ফযরের সালাত আদায় করে দু'জনে মিলে হালকা নাশতা করলাম। নাস্তা সেরে বের হলাম যমুনার উদ্দেশ্যে। প্রথমে চৌরাস্তা থেকে টাংগাইল। তারপর ওখান থেকে সিএনজি করে যমুনা সেতু। চৌরাস্তা গিয়ে টাঙ্গাইলগামী দুটি টিকেট কেটে নিলাম । পাঁচ মিনিট পর গাড়ি ছাড়বে। গাড়িতে উঠলাম। মু'আয বরাবরের মতো জানালার পাশের সিটটা দখল করে নিল। বললাম আমি আজ বসি জানালার পাশে? বিরসবদনে জওয়াব দিল-এটা সম্ভব না। আমিই বরং বসবো জানালার পাশে।

মু'আযের সাথে কখনো তর্ক করিনা। তবে আজ ওর প্রতি বিরক্তির দৃষ্টি দিয়ে গজরাতে গজরাতে উঠে গেলাম ওর সিট থেকে। মু'আয এক চিলতে হাসি দিয়ে বসে গেলো জানালার পাশে। গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেলো। গাড়ি ছাড়লো। গাড়ি চলতে লাগলো বিরতিহীন। সবুজের বুক ছিঁড়ে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। রাস্তার দুপাশে সারি সারি গাছ। যেন ক্রমেই এক টুকরো রূপকথার রাজ্যে হারিয়ে যাচ্ছি।

অভূতপূর্ব এক মায়াবি দেশ বাংলাদেশ। আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি । এইতো আর একটু। এদিকে ফিনফিনে রোদ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। বেলা আটটা ছুঁই ছুঁই। অবশেষে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছলাম। গাড়ি থেকে নামলাম। দুমিনিট হেঁটে তারপর ওখান থেকে সিএনজি করে দশ পনেরো মিনিটের ব্যবধানে যমুনা নদীর ধারে। সিএনজি থেকে নেমে নদীর পাড়ে যাওয়ার আগে সকালের খাবার দাবার সেরে নেওয়া প্রয়োজন। যেই কথা সেই কাজ। ঘরোয়া পরিবেশে খাবার খেতে এক হোটেলে প্রবেশ। খাবার দাবার শেষ করে হাঁটছিলাম।

যমুনার আশেপাশে ছোট ছোট অনেকগুলো পার্ক। তাছাড়া যমুনার বিস্তীর্ণ সীমানা জুড়ে সামরিক বাহিনীর বসবাস। আমরা একতরফা হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে চলে গেলাম যমুনার তীরে। কি এক সৌন্দর্যের আস্ফালন। যমুনার ওপারে যেন আকাশ নেমে আসছে-মেঘেরা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কি বিশালতা নদীর। সৌন্দর্য দেখতে দেখতে জনম ফুরিয়ে যাবে। নদীর সবটা জুড়ে কচুরিপানার ন্যায় ভাসছে শত শত ডিঙি নৌকা। জেলেরা মাছ ধরছে। মাঝেমধ্যে কালো রঙা-প্রাণী প্রজাতির কি যেন ভেসে ওঠে নদীর এখানে ওখানে। অবলোকনের পূর্বেই আবার তলিয়ে যায় জলের নীচে। যমুনা সেতুর কথা কতো শুনেছি। আজ দেখলাম। চোখ যেন ফিরাতেই ইচ্ছে করেনা নদীর সৌন্দর্য থেকে। এভাবে এফোড়-ওফোড় ঘুরতে ঘুরতে কেটে গেল এক প্রহর। শনৈ শনৈ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।বহু রাঙা সূর্য যেন যমুনার অতল দেশে হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আমাদের ফেরার সময়ও আনন্দের দুয়ারে কড়া নাড়ল।

শিক্ষার্থী - জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া আজিজিয়া, মুহাম্মাদপুর ঢাকা।

হারিয়ে যাওয়া চিঠি

প্রিয় বন্ধু, আমার সালাম নিও।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

জীবনে চলার পথে আমাদের কতই-না স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা রয়েছে। সময়ের পালা বদলে স্মৃতিগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। ক্লাসের মধ্যে পড়াগুলো নিয়ে কত ঝগড়া-বিবাদ করেছি। যেদিন ক্লাসের পড়া শেখা হয়নি, সেদিন কত বাহানা করে পড়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছি। উস্তায বুঝতে পেরে কিছু বলতেন না। দ্বিতীয়বার আবার বুঝিয়ে দিতেন। আজ যে, সব স্মৃতি হয়ে গেছে। এইতো সেদিনের কথা, এক সঙ্গে ক্লাস না করে ঘুরে যাওয়ার কারণে উস্তাযের কাছে মার খেয়েছি।

ছুটির দিনে কত আয়োজন থাকতো। আনন্দের জোয়ার থাকতো। রাতের পড়া রেখে ঝালমুড়ির আয়োজন জমতো খুব বেশ। ঝালমুড়ির আয়োজন করতে অনেক মারও খেতে হয়েছে। আচ্ছা তোমাদের ঐ ঘটনা কি মনে আছে, ঈদুল আযহার ছুটিতে কক্সবাজার ভ্রমণের কথা! এখন শুধু স্মৃতিগুলো আমাকে তাড়া করে বেড়ায়।

এক সাথে ১০ বছরের স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা। উস্তাযের সাথেও কত ঘটনা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। সময়ের কারণে আজ কোথায় হারিয়ে গেছে আমাদের সেই ছোট বেলার গল্পগুলো। রাতে ঘুমানোর আগে সকলে মিলে গল্প করতাম একসাথে। কত হাসাহাসি, কত মারামারি করেছি একে অপরের সাথে। কিন্তু কখনো বন্ধুত্বের মাঝে ফাটল করিনি। আজ সেই বন্ধুত্ব কোথায় যেন লুকিয়ে আছে। বন্ধু তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন, ভালো থেকো। দোয়া করি জীবনে অনেক উন্নতি করো। এই প্রত্যাশা আমার। প্রিয় বন্ধু, দোয়া চাই সকলের কাছে।

ইতি

তোমাদের বন্ধু

২৩-০৪-২০২৪ খ্রি.

মাসিক
নবীনকণ্ঠ পরিবার

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী হা.
মুহাদ্দিস, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা

মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী
গবেষক ও অনুবাদক

মুহা. হাছিব আর রহমান
সম্পাদক ও জার্নালিস্ট

মাকামে মাহমুদ
সম্পাদক ও প্রুফরিডার

কাজী মারুফ
কবি ও গীতিকার

আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী
খতিব ও কলামিস্ট

মাওলানা মাহফুজ হুসাইনী
সহ-সম্পাদক, বাংলাদেশের খবর

মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের
শিক্ষক, মারকাযুত তারবিয়াহ বাংলাদেশ,সাভার, ঢাকা

মুহা. সায়েম আহমাদ
কলামিস্ট ও সংগঠক

রাশেদ নাইব
কবি ও লেখক

বিন-ইয়মিন সানিম
শিক্ষক ও প্রুফরিডার

মুফতী মাসউদ আলিমী
শিক্ষক, খতিব ও অনুবাদক

মুফতী সাইফুল্লাহ বিন কাসিম
শিক্ষক ও লেখক

মুফতী ইমদাদুল্লাহ
শিক্ষক ও অনুবাদক

মাও. হাবীব উল্লাহ
পরিচালক, তিজারাহ আসলী

আনিসুর রহমান আফিফি
শিক্ষক ও লেখক

মুহা. আব্দুর রশীদ
প্রাবন্ধিক ও লেখক

শেখ মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ
সম্পাদক ও শিক্ষক

জুবায়ের আহমেদ
লেখক

ওলিউল্লাহ তাহসিন
শিক্ষক, মারকাযুসসুন্নাহ, উত্তরা, ঢাকা

জাবের মাহমুদ
শিক্ষক

শামসুল আরেফীন
ছড়াকার

হুসাইন আহমদ
শিক্ষক ও লেখক

তাশরীফ আহমদ
শিক্ষক ও লেখক

তাওসীফ আহমাদ
শিক্ষক ও লেখক

উসমান বিন আব্দুল আলিম
সম্পাদক, নবীনকণ্ঠ

৩য় বর্ষ । ৪র্থ সংখ্যা । এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.

- আলাদা আলাদা আমরা এক বিন্দু, কিন্তু একত্রে আমরা এক সাগর।
- ঐক্যের প্রধান হাতিয়ার: আমানতদারিতা, নম্রতা ও বিশ্বস্ততা।

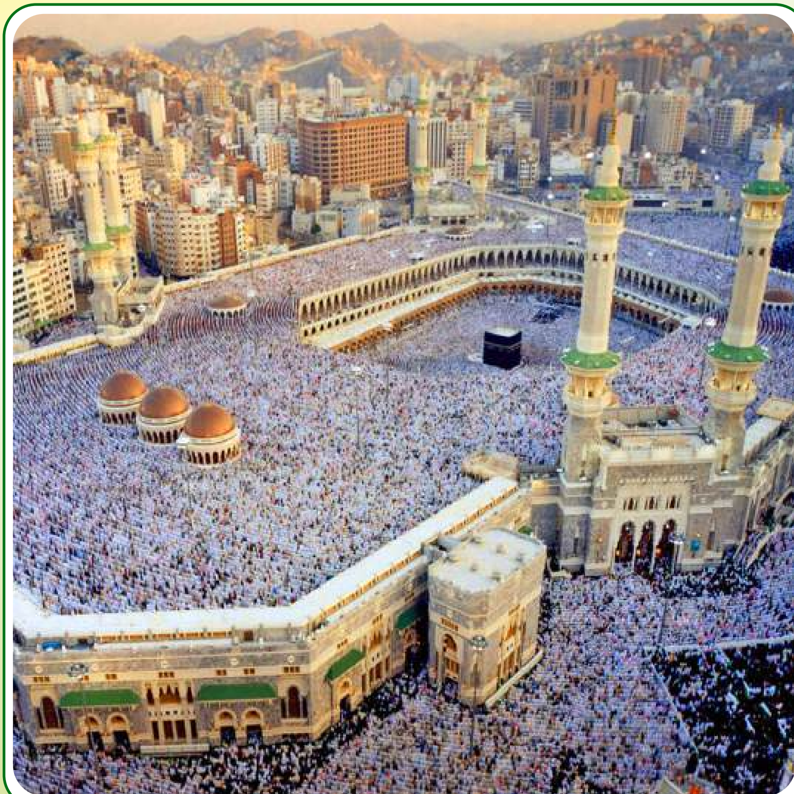

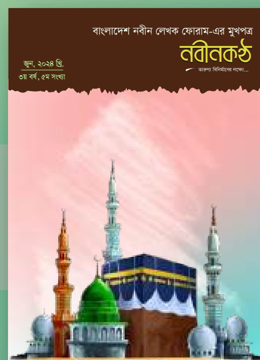

সৌজন্যে:

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

(শুদ্ধ লেখনীর ধারায় সুদূর অগ্রযাত্রা)

ব্যবস্থাপনায়

ও. এম. প্রকাশনী

(তারুণ্যের সৃজনশীলতা বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়)

ইমেইল: nobinkanthobnlf@gmail.com

যোগাযোগ: 01789204674